Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পশ্চিমা সভ্যতা ও ইসলামী সভ্যতা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

উম্মে কুলসুম চৌধুরী

রোলঃ 2271573

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পশ্চিমা সভ্যতা ও ইসলামী সভ্যতা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

উম্মে কুলসুম চৌধুরী

রোলঃ 2271573

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " পশ্চিমা সভ্যতা ও ইসলামী সভ্যতা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে উম্মে কুলসুম চৌধুরী, আইডিঃ 2271573বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " পশ্চিমা সভ্যতা ও ইসলামী সভ্যতা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

উম্মে কুলসুম চৌধুরী

আইডিঃ 2271573

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

No table of contents entries found.

সূচিপত্র

ভুমিকা:
সভ্যতার গঠন
সভ্যতার উদ্দেশ্য
ইসলামী সভ্যতা
পশ্চিমা সভ্যতা
সভ্যতা উন্নয়ন এর অপরিহার্য উপাদান
মুসলিমদের মানসিক বিপর্যয়
পশ্চিমা সভ্যতার বুনিয়াদ

উপসংহার
রেফারেন্স

সভ্যতা ও তার গঠন

সভ্যতা কী? এ প্রশ্নের উত্তরে বিশিষ্ট লেখক ও ইসলামি চিন্তাবিদ আব্দুর রহমান আজ্জাম লিখেছেন—

'সভ্যতা একটি মশালের মতো, যা যুগে যুগে এক জাতির হাত হতে অন্য জাতির হাতে স্থানান্তরিত হয়েছে।

পৃথিবীর সূচনাকালেই মানব সভ্যতার গোড়াপত্তন। পৃথিবীর বয়স কয়েক হাজার কোটি বছর; মানুষও এখানে বসবাস করছে কোটি কোটি বছর ধরে। মানুষের জীবনযাপনের ধারা ও ইতিহাস যাই হোক না কেন, পুরো সময় ধরেই এই পৃথিবী কোনো না কোনো সভ্যতার বুকেই আশ্রয় নিয়েছিল। জানা-অজানা শত শত সভ্যতার উত্থান-পতনের নীরব স্বাক্ষী পৃথিবী নামক গ্রহ। কোনো সভ্যতা তার সূচনালগ্নেই ভেঙে পড়েছে অথবা অন্য কোনো সভ্যতার আগ্রাসনের শিকার হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়েছে কিংবা পরিবর্তিত হয়েছে। বিপরীতে কোনো কোনো সভ্যতা প্রচণ্ড দাপট ও শৌর্য-বীর্য নিয়ে যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে টিকে থেকেছে। পৃথিবীর ওপর ছড়ি ঘুরিয়েছে প্রচণ্ড প্রতাপের সঙ্গে। সমগ্র পৃথিবী বা তার অংশবিশেষের ওপর স্থায়ী কিংবা অস্থায়ী প্রভাব বলবৎ রেখেছে। ভালো-মন্দ উভয়বিধ প্রভাবে মানব সভ্যতাকে প্রভাবিত করেছে।

গ্রিক সভ্যতা, রোমান সভ্যতা, দ্রাবিড়, বৌদ্ধ, আর্য ও চৈনিক সভ্যতা এবং সবশেষে ইসলামি সভ্যতাসহ অনেক সভ্যতাকে পৃথিবীর স্বস্ব স্থানে ভাস্বর দেখতে পাই । মানুষের জীবনযাপন, উত্থান-পতন, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সুখ-দুঃখসহ সামগ্রিক জীবনব্যবস্থাকে ঘিরে সভ্যতা গড়ে ওঠে। তাই সভ্যতার মূল উপাদান হলো মানুষ ।

সভ্যতার উদ্দেশ্য

সভ্যতার মূল উদ্দেশ্য জীবদ্দশায় মানুষ যেন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারে। আত্মিক, জৈবিক ও দৈহিক চাহিদাসমূহ পূরণের অনুকূল পরিবেশ পায় । সুখ-শান্তি, প্রগতি ও কল্যাণের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হতে পারে এবং সে আসনে আসীন থাকতে পারে। সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করাটাই হলো সভ্যতার উদ্দেশ্য

মানুষ অনেকটা আগ্নেয়গিরির মতো। যার ভেতরে লুকিয়ে থাকে শান্ত লাভার মতো সুপ্ত প্রতিভা! যেকোনো মানুষের ভেতরেই বিরল ও দুর্লভ প্রতিভা সুপ্তাবস্থায় লুকিয়ে থাকতে পারে। সভ্যতা হলো সেই শক্তি, যা মানুষের ভেতরে সুপ্তাবস্থায় লুকিয়ে থাকা এই প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্র তৈরি করে এবং সযত্নে লালন করে । মানুষের ভেতরে এসব কল্যাণকর প্রতিভার বিকাশ, লালন ও ক্রমোন্নয়নের মাধ্যমে তা পূর্ণতার স্তরে উন্নীত হয়।

একটি সভ্যতার দায়িত্ব হলো, মানুষের সকল ধরনের যোগ্যতা ও মেধার যথাযথ মূল্যায়ন করা। এর সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে বৃহত্তর মানবতার কল্যাণের ধারা উন্মুক্ত করা এবং তা অব্যাহতভাবে চালু রাখা। সেইসঙ্গে এই ধারা যেন উন্নত স্তর ও মান বাজায় রেখে পরবর্তী বংশধরদের হাতে স্থানান্তরিত হতে পারে, তা নিশ্চিত করা।

এই কঠিন দায়িত্বগুলো পালনে যে সভ্যতা যত বেশি এগিয়ে, সে সভ্যতা তত বেশি সফল। আর এই সভ্যতাই বিশ্বসভায় শ্রেষ্ঠ সভ্যতা হিসেবে বিবেচিত হয় । প্রতি যুগের মানুষের কাছে সমাদৃত হয়। শুধু প্রাচুর্য, ধন-সম্পত্তি, বিলাস-ঐশ্বর্য দেখে একটি সভ্যতাকে উন্নত বলে রায় দেওয়া নিতান্তই অযৌক্তিক। বস্তুগত উন্নতি, জাঁকজমক, ক্ষমতা, প্রতাপ-প্রতিপত্তির বাহুল্য উপস্থিতি একটি সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের মাপকাঠি হতে পারে না, হওয়া উচিতও নয়; বরং এ ক্ষেত্রে দেখা উচিত,

সভ্যতা ও তার গঠন

একটি সভ্যতা মানব সমাজের সদস্যদের চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস-আকিদা ও ইতিহাস-ঐতিহ্যকে ক্রমবিকাশ ও উত্তরণের ক্ষেত্রে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে। একইসঙ্গে কতটা আলোড়িত করেছে। নৈতিক দিকটাকে কতটা গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপন করতে পেরেছে। উন্নয়নকে কতটা সংজ্ঞায়িত করতে পেরেছে। নৈতিকতার বাস্তব ও চিরন্তন মডেল কতটা দাঁড় করাতে পেরেছে। সমাজ কাঠামোর সদস্যদের নৈতিকতাকে কতটা উন্নত ও আলোড়িত করতে পেরেছে। উৎকৃষ্ঠ নৈতিকতা অর্জন ও সংরক্ষণে তাদের কতটা উজ্জীবিত, অনুপ্রাণিত করতে পেরেছে। এগুলোই হলো সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের মাপকাঠি। এসব বিষয়ের নিরিখেই বিচার করে দেখা উচিত, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সভ্যতা কোনটি?

সভ্যতার গঠন

সভ্যতার গঠনতন্ত্রে একটা নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী ও ভূখণ্ড অনিবার্য দুটো উপাদান । সভ্যতার সূচনা ও ক্রমবিকাশের জন্য আরও চারটি মৌলিক উপাদান বিদ্যমান । এগুলোকে বাদ দিলে সূচনাতেই একটি সভ্যতা বিলুপ্ত হতে বাধ্য।

অর্থনৈতিক উপায়-উপকরণ ও কর্মপদ্ধতি

- প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক অবকাঠামো

.

নৈতিক রীতি-নীতি ও বিধিবিধান

•

জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড

ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সর্বোপরি একটি সমাজ- -জীবনের প্রথম চাহিদা হলো অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা। এই প্রয়োজনের খাতিরেই গড়ে উঠে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। এ ক্ষেত্রে সফলতা-ব্যর্থতা সামগ্রিকভাবে একটি জাতি এবং বিচ্ছিন্নভাবে জাতির প্রতিটি সদস্যকে প্রভাবিত করে। তাদের সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন ও ভালো-মন্দকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই সভ্যতা গড়ে ওঠার একটি অন্যতম উপাদান হলো অর্থনৈতিক উপায় উপকরণ ও কর্মপদ্ধতি ।

সমাজের মানুষের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো শান্তি-সম্প্রীতি, মায়া-মমতা ও সৌহার্দ্য-ভালোবাসার উন্মেষ ঘটানো। প্রত্যেকের মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করা, তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক নিরাপত্তা দেওয়া, সমাজে অন্যায়-অনাচার প্রতিরোধ, দুষ্টের দমন, শিষ্টের লালন করা। সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রের অবকাঠামো নির্ধারণ, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ করা। এ গুরুদায়িত্ব কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী দ্বারা এককভাবে আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব নয়; বরং এসব বিষয়ে সমাজের সকলেই কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠ সচেতন নাগরিকের মতামতের ভিত্তিতে নিজেদের পছন্দমতো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা প্রয়োজন।

এটি খুব সাধারণ একটি দৃষ্টিভঙ্গি। সভ্যতার বিচারে সমাজবিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণ আরও গভীরে দৃষ্টিপাত করে থাকেন। তারা দেখেন, সভ্যতার আদর্শিক শক্তি মানব প্রকৃতির জন্য কতটা উপযোগী এবং এটি সমাজের সদস্যদের চেতনার মর্মমূলে কতটা প্রবেশ করতে পেরেছে। তারা সমাজ সভ্যতার উন্নয়ন ও স্থায়িত্বের জন্য কিছু মৌলিক উপাদান ও মৌলিক কার্যকারণের প্রতি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিপাত করেন। যাচাই করে দেখেন, একটি সভ্যতার নীতি-নৈতিকতা, আকিদা-বিশ্বাস ও শিক্ষা-সংস্কৃতি দিয়ে মানুষের ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি, লেনদেন, সামাজিক বন্ধন ও জীবনাচারকে কতটা উন্নত ও সমৃদ্ধ করতে পেরেছে। তাদের একক ও সামষ্টিক জীবনে সংস্কৃতির সুফল কতটা আহরণ করতে পেরেছে। তাদেরকে নিজেদের জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে সম্বন্ধে কতটা সচেতন করে তুলতে পেরেছে। জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক বিষয়গুলোকে কতটা সরবরাহ করতে পেরেছে। এসবের ভিত্তিতেই একটি সভ্যতার সার্বিক বিচার করা হয়।

পৃথিবীতে কোনো সভ্যতা পরম উন্নত ও স্থায়ী আদর্শ সভ্যতায় পরিণত হতে পারে না । সেটা যে কালে, যে স্থানেই গড়ে উঠুক না কেন; বরং সভ্যতার নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক মানবগোষ্ঠী তাদের সুচিন্তিত গবেষণা, মতামত ও প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার মাধ্যমে কালের পরিক্রমায়

ক্রমাগতভাবে সভ্যতার উত্তরণ ঘটাতে থাকে। এভাবে তারা সভ্যতাকে শুধু নিজেদের সমাজের জন্যই নয়; বরং গোটা বিশ্বমানবতার জন্যই একটি কল্যাণের উৎস ও মাধ্যম বানিয়ে নিতে পারে ।

সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করে মানব সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য সভ্যতার ক্রমাগত উন্নয়ন অপরিহার্য। বিনা পরিশ্রমে, বিনা প্রচেষ্টায় সভ্যতা উন্নত হয় না; প্রয়োজন সুপরিকল্পিত কর্মপ্রচেষ্টা । সুবিন্যস্ত কর্মপরিকল্পনা এবং নিরন্তর প্রচেষ্টার মাধ্যমেই কেবল কাঙ্ক্ষিত সভ্যতা নির্মিত হতে পারে ।

সভ্যতার উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা চালানোর আগে এ কথা ভালোভাবে জেনে নেওয়া প্রয়োজন, সভ্যতার উন্নয়নের জন্য কিছু অপরিহার্য উপাদান থাকতে হবে; যা দিয়ে সভ্যতার উত্তরণ ও উন্নয়ন ঘটানোর প্রয়াস চালানো যায়। এগুলোকে আমরা সভ্যতার উন্নয়নে অপরিহার্য উপাদান বলে আখ্যায়িত করতে পারি ।

সভ্যতার উন্নয়নের অপরিহার্য উপাদানসমূহ

ধর্ম

সভ্যতার উন্নয়নের প্রথম উপাদান হলো ধর্ম। এখানে বিশেষ কোনো ধর্মের কথা বলছি না । সভ্যতার উন্নয়ন, ক্রমবিকাশ ও উত্তরণের জন্য একটা ধর্মীয় দর্শন ও আদর্শের উপস্থিতি একেবারেই অপরিহার্য শর্ত। সে ধর্ম বাতিল না সত্য; সে বিতর্ক আপাতত সাময়িক সময়ের জন্য এড়িয়ে চলছি।

ধর্ম আসলে কী? এ প্রশ্নের উত্তরে বিস্তারিত আলোচনা ও বিতর্কের সূত্রপাত হতে পারে। তাই সে দিকে না গিয়ে আমরা অতি সংক্ষেপে ধর্মের মূল তত্ত্ব (Core Cocept of Religon) বুঝতে চেষ্টা করব ।

ধর্ম মানুষের বোধ-বিশ্বাস ও আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী কিছু বিশ্বাস । জীবনের সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনাকারী কিছু নির্দেশনা ও শিক্ষা; যা তাকে নিজের অবস্থান ও গন্তব্য জানিয়ে দেয় এবং জীবনপথ পাড়ি দিতে সহায়তা করে ।

এই পৃথিবীতে অতীতে যত ধর্ম বিদ্যমান কিংবা বর্তমানে যত ধর্ম বিদ্যমান আছে, তার প্রতিটিই কিছু বিশ্বাস ও নির্দেশনার সমষ্টি মাত্র। এসব বিশ্বাস ও নির্দেশনার ভিত্তিতে মানুষ তার কর্মকাণ্ডকে বিস্তৃত করে । কোথাও কোথাও নিয়ন্ত্রণও করে ধর্মীয় বিশ্বাস তার মন-মগজে স্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি করে । ধর্মীয় চেতনা তাকে উদ্দীপ্ত ও উজ্জীবিত করে, সার্বিক মানবীয় সত্তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত সভ্যতা গড়ে উঠেছে, তার প্রতিটিই কোনো না কোনো ধর্মবিশ্বাস বা দর্শন দ্বারা আংশিক অথবা পূর্ণরূপে প্রভাবিত, পরিচালিত ও

পরিশীলিত হয়ে ক্রমান্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা কাঠামোতে রূপ নিয়েছে। প্রাচীন গ্রিক, রোমান, চৈনিক,

সভ্যতার উন্নয়নের অপরিহার্য উপাদানসমূহ

আর্য থেকে শুরু করে ইসলামি সভ্যতা সবগুলোই কোনো না কোনো দর্শনের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। সর্বশেষ বর্তমান বিশ্বের প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্য জুড়ে বিদ্যমান পশ্চিমা জড়বাদী সভ্যতাও নির্দিষ্ট দর্শন ভিত্তিমূলের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে।

ধর্ম হলো সভ্যতার গঠন প্রক্রিয়ায় একটি অনিবার্য প্রয়োজনীয় অনুসঙ্গ। পূর্বের আলোচনায় আমরা সভ্যতার চারটি মৌলিক উপাদানসমূহের মধ্যে তৃতীয় উপাদানটিকে 'নৈতিক রীতি-নীতি ও বিধিবিধান' হিসেবে আখ্যায়িত করেছি। কিন্তু এখানে আমরা ধর্ম বলতে শুধু গুটিকতক সুনির্দিষ্ট বিধিবিধানকে বোঝাচ্ছি না; বরং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, জীবনদর্শনকে বোঝাতে চাচ্ছি।

বস্তুত ধর্ম ছাড়া এ পর্যন্ত বিশ্বে কোনো সভ্যতাই গড়ে ওঠেনি এবং ভবিষ্যতেও গড়ে উঠতেও পারে না। সোভিয়েত রাশিয়ায় ধর্ম বিবর্জিত একটি নতুন সভ্যতা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চলেছিল । একটি নতুন সভ্যতা(?) প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় তারা ধর্ম-দর্শন ও সকল বিধিবিধান ত্যাগ করেছিল। মুখে ধর্মহীন সভ্যতার ইশতেহার উচ্চারিত হলেও বাস্তবে কি তারা আদৌ কোনো ধর্ম-দর্শনকে ত্যাগ করতে পেরেছিল? অহিভিত্তিক ঐশীধর্ম বলে পরিচিত সকল ধর্মকে পরিত্যাগ করলেও প্রকৃতপক্ষে নিজেদের অলক্ষ্যে ও অজান্তেই নতুন এক ধর্মের গোড়াপত্তন করে বসেছিল । তাদের দ্বারা নব উদ্ভাবিত এ ধর্মটির নাম হলো 'কমিউনিজম' ।

পৃথিবীতে প্রচলিত সকল ধর্ম-দর্শনকে অস্বীকার করে তদস্থলে তারা নিজেদের মনগড়া নতুন এক দর্শনের গোড়াপত্তন করে এবং সেই দর্শনের বাহুডোরে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে । এটা অবশ্যম্ভাবীভাবে এ কারণেই হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে ধর্ম বা দর্শন ছাড়া কোনো কালেই কোনো সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে না। এমনকী সভ্যতার সূচনাও হতে পারে না ।

ধর্মহীনতা, ধর্মের নাগপাশ হতে মুক্তি, এসব প্রলাপ মূলত আপামর জনসাধারণকে বোকা বানানোর এক প্রতারণাপূর্ণ কৌশল । ধর্মের বিরুদ্ধে মানুষকে বিষিয়ে তুলে নিজেদের জ্ঞান এবং বুদ্ধিজাত নবগঠিত দর্শন কমিউনিজম-এর ফাঁদে বিশ্ব মানবতাকে জড়িয়ে নেওয়ার এক কূটকৌশল মাত্র। কমিউনিজম নামের নতুন ধর্ম-দর্শনটি মানবীয় সকল প্রাকৃতিক সত্তার সাথে কট্টরভাবে সাংঘর্ষিক। নৈতিকতা, জ্ঞান ও আদর্শের দৃষ্টিকোণ বিবেচনায় সম্পূর্ণ ও শোচনীয়রূপে অন্তঃসারশূন্য। নব সৃষ্ট কমিউনিজম মাত্র সত্তর বছরের মধ্যেই নিজ জন্মভূমিতে মুখ থুবড়ে পড়ে। যে সময় ধরে এ সভ্যতাটি টিকে ছিল বলে যে দাবি করা হয়, আসলে

তাকে টিকে থাকা না বলে কৃত্রিমভাবে টিকিয়ে রাখার একটা হাস্যকর প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে, এমনটা বলা উচিত।

কোটি কোটি মানব সন্তানকে হত্যা করে, নিজেদের ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছেদ করে, উদ্বাস্তু বানিয়ে এক মহাসাগর পরিমাণ ঘাম, রক্ত আর অশ্রুর সাগরে তৈরি নতুন এই আদর্শের অনিবার্যভাবেই ভরাডুবি ঘটেছে। ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লবের পর থেকে সত্তর বছর ধরে কমিউনিস্ট সভ্যতা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলেছিল। এই পুরো সময়টা কমিউনিস্ট সভ্যতা প্রতিষ্ঠাকারীদের জন্য এক ভয়ংকর ক্রান্তিকাল ছিল। এটা ছিল তাদের চিন্তা-চেতনার অন্তঃসারশূন্যতা এবং নিজেদের ব্যর্থতা উপলব্ধির সময়কাল ।
সমগ্র বিশ্বের বিদগ্ধ জ্ঞানী, গুণী ও সুধীজন চিৎকার করে সাবধান করে দেওয়া সত্ত্বেও উদ্যোগ গ্রহণকারী মহারথীদের তাদের আদর্শের ত্রুটি উপলব্ধি করতে সময় লেগেছে সত্তরটি বছর! ধর্ম ছাড়া কোনো সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে না; এক সময় এই মহাসত্যটি তাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। আর এর সাথে সাথে তারা স্বেচ্ছায় ও স্বপ্রণোদিতভাবে কমিউনিজম নামের তথাকথিত আদর্শকে একরাশ ঘৃণা আর অবজ্ঞার নিয়ে ভলগায় ডুবিয়েছে! এভাবেই স্বতঃসিদ্ধ এ ধারণাটি আরও একবার প্রমাণিত হয়েছে, 'ধর্ম-দর্শন ছাড়া কোনো সভ্যতা গড়ে ওঠে না, সভ্যতা টিকে থাকতে পারে না। ধর্ম হচ্ছে সভ্যতার উন্নয়ন ও গঠনে অনিবার্য এক উপাদান ।

ভাষা

ভাষা হচ্ছে সভ্যতার উন্নয়নে দ্বিতীয় অপরিহার্য অনুসঙ্গ । ভাষা মানুষকে তার মনের ভাব, কষ্ট, সুখ-দুঃখ, চাওয়া-পাওয়া, প্রয়োজন ও আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের সুযোগ করে দেয়। পৃথিবীতে এমন একটা দিন যায়নি, যেদিন মানুষ তার মনের ভাব ও অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে কোনো ভাষার সাহায্য নেয়নি।
একটি জনগোষ্ঠী তাদের একই সাংস্কৃতিক বলয়ের মধ্যে নিজেদের ভাবের পরস্পর আদান-প্রদানের লক্ষ্যে স্বরভিত্তিক কিছু শব্দকে নির্দিষ্ট করে নিয়েছে। এর ব্যাখ্যা তারা নিজেরাই করেছে এবং সেই ব্যাখ্যার ব্যাপারে ঐক্যমতও তৈরি করে নিয়েছে । আর সেটাকেই তারা নিজেদের ভাব ও অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এটিই হলো তাদের ভাষা. এভাবেই ভাষা গঠিত হয়েছে।
যার মাধ্যমে এগুলোকে আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব হবে। আর এই প্রতিষ্ঠানের নামই হলো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং তার অবকাঠামোই হলো
সভ্যতার দ্বিতীয় মৌলিক উপাদান ।

মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস, জীবন, পরিচালনা ও সম্পাদনা, মেলামেশার পথ ও পদ্ধতি; রাষ্ট্রের নাগরিক ও সমাজের অধিবাসী হিসেবে বসবাস ও চলাচলের জন্য কিছু সর্বগ্রাহ্য, উপযোগী, সহজ ও সাবলীল নিয়ম-কানুন ছাড়া কখনোই কোনো সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে না। তাই নৈতিক রীতি-নীতি ও বিধিবিধান হলো সভ্যতার তৃতীয় মৌলিক উপাদান ।

সমাজে বসবাসকারী মানবমণ্ডলীর মানবীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ বজায় রাখা, তাদের মানবীয় প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির মান উন্নয়ন করা, তাদেরকে সমাজ-সভ্যতায় কর্মক্ষম ও যুগোপযোগী রাখা, সমাজ সকল জীবের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করা এবং অপরের অধিকার সম্পর্কে দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত করা একটি সভ্যতার গুরত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন করতে হলে তাদেরকে ন্যায়-অন্যায় ও মঙ্গল-অমঙ্গলের সম্যক ধারণা দিতে হবে। সেইসঙ্গে সমাজ-সভ্যতা গঠনে তাদের প্রত্যক্ষ অংশীদারিত্ব ও দায়িত্ব গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সৃষ্টি এবং তা বিকাশের সহজ ও সাবলীল পথ থাকতে হবে। এই জ্ঞান-বিজ্ঞান, আকিদা বিশ্বাসের চর্চা প্রত্যহিক জীবনের কর্মকাণ্ডে ও আচার-আচরণে লালনের মাধ্যমেই গড়ে উঠে একটি সমাজের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। তাই একটি সভ্যতা গড়ে উঠার পেছনে জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা শিক্ষা-সংস্কৃতির উপস্থিতি হলো সভ্যতার চতুর্থ মৌলিক উপাদান ।

মানুষের দ্বারা, মানুষের জন্য এবং মানুষের মধ্যেই একটি সভ্যতা গড়ে ওঠে মানুষই হলো সভ্যতার মৌলিক প্রতিপাদ্য বিষয়। মানুষই সভ্যতার প্রস্তুতকারক, পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক। সভ্যতার দ্বারা মানুষের জীবনের সকল দিক প্রভাবিত হয়। আবার উলটো করে মানুষের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড, জীবনাচার ও সফলতা- ব্যর্থতা দ্বারাও সভ্যতা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। সময়ের সাথে সাথে সভ্যতার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়। স্থায়ী-অস্থায়ী, ভালো-মন্দ পরিবর্তনের ছাপ সভ্যতা তার সদস্যদের কথা কাজ, চাল-চলন ও আচার-আচরণের মাধ্যমে ধরে রাখে

সভ্যতার দৃশ্যমান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপ হলো মানুষের নৈতিকতা, আচার-আচরণ, জীবনবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি। মানুষের উন্নত নৈতিকতা, জীবনাচার ও মহৎ দৃষ্টিভঙ্গি দেখেই আমরা বুঝে থাকি সংশ্লিষ্ট সভ্যতা নিজে কতটা উন্নত এবং কতটা উন্নত আদর্শের ধারক।

ইসলামের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে ইসলামি সভ্যতার উৎপত্তি হয়েছে। ইতিহাসের দীর্ঘ পরিক্রমায় বহু চড়াই-উতরাই পেরিয়ে স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস সমৃদ্ধি অর্জন করেছে ইসলামি সভ্যতা। ইসলাম বিশ্বকে এমন এক সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও সমাজব্যবস্থা উপহার দিয়েছে, যা গোটা মানবজাতির মুক্তি ও কল্যাণের পাথেয় হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। অথচ পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীরা বিশ্ববাসীকে এটা বুঝাতে সচেষ্ট যে, পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি ধারণ করা ছাড়া অন্যদের

আর কোনো উপায় নেই। কারণ, তাদের দৃষ্টিতে ইসলামি সভ্যতা নয়, বরং পশ্চিমা সভ্যতাই সর্বশ্রেয়।

প্রাচ্যের দেশগুলোর সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করার পেছনে পাশ্চাত্যের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো, প্রাচ্যের দেশ ও জাতিগুলোর নানা অর্জনকে অস্বীকার করে।

সব উন্নয়ন, অ্যগ্রগতি ও অর্জনকে নিজেদের অর্জন হিসেবে তুলে ধরা। পাশাপাশি মুসলমানদের উন্নয়ন ও অগ্রগতি ঠেকানোও অন্যে অন্তত উদ্দেশ্যের প্রধান ব্যাপার।

ইরানের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শাফিয়ি সার্কেস্তানি মদে করেন, পশ্চিমারা বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে উন্নত প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক শক্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে এবং এখন তারা এই প্রযুক্তি ও শক্তি দিয়ে গোটা বিশ্বে নিজেদের সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। পাশ্চাত্য সম্ভাব্য সকল উপায়ে প্রাচ্যের ওপর নিজেদের রীতি-নীতি ও সংস্কৃতি চাপিয়ে দিচ্ছে। পাশ্চাত্য নিজেদের বিশ্বমানবতার কল্যাণকামী ও শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী হিসেবে তুলে ধরায় পাশাপাশি অন্যদের ওপর নিজেদের মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি ডাশিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছে। তাদের এসব অপতৎপরতা ও ভ্রান্তি উল্লাহর সামনে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। ইসলামি সংস্কৃতি ও সভ্যতার ব্যাপারে সংকলিত এই গ্রন্থটি সে প্রচেষ্টারই অংশ।

পশ্চিমা সভ্যতা কি এবং এর উৎপত্তি :

পশ্চিমা সভ্যতার ইতিহাস

পশ্চিমা সভ্যতার শিকড় ইউরোপ ও ভূমধ্যসাগরে ফিরে যায়। এটি প্রাচীন গ্রিস, রোমান সাম্রাজ্য ও মধ্যযুগীয় পশ্চিমা খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে যুক্ত, যা মধ্যযুগ থেকে স্কলাস্টিকবাদ, রেনেসাঁ, সংস্কার, আলোকিতকরণ, শিল্প বিপ্লব, বৈজ্ঞানিক বিপ্লব ও উদার গণতন্ত্রের বিকাশের মতো রূপান্তরমূলক পর্বগুলি অনুভব করে উদ্ভূত হয়েছিল। ধ্রুপদী গ্রীস ও প্রাচীন রোমের সভ্যতাগুলিকে পাশ্চাত্য ইতিহাসে প্রধান সময় হিসাবে বিবেচনা করা হয়। প্রধান সাংস্কৃতিক অবদানও খ্রিস্টানকৃত জার্মানিক জনগণ, যেমন ফ্রাঙ্কস, গথস ও বারগুন্ডিয়ানদের কাছ থেকে

এসেছে। শার্লমাইন ক্যারোলিংজীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এবং তাকে "ইউরোপের পিতা" হিসাবে উল্লেখ করা হয়।[১] প্রাক-খ্রিস্টীয় ইউরোপের পৌত্তলিক জনগণের কাছ থেকেও অবদানের আবির্ভাব ঘটেছিল, যেমন সেল্টস ও জার্মানিক পৌত্তলিকদের পাশাপাশি ইহুদি ধর্ম ও হেলেনিস্টিক ইহুদি ধর্ম থেকে প্রাপ্ত কিছু উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় অবদান যিহূদিয়ার গালীলের দ্বিতীয় মন্দির এবং প্রথম দিকের ইহুদি প্রবাসীদের মধ্যে ফিরে আসে;এবং কিছু অন্যান্য মধ্যপ্রাচ্যের প্রভাব।পশ্চিমা সভ্যতার গঠনে পশ্চিমা খ্রিস্টধর্ম একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে, যা তার ইতিহাসের বেশিরভাগ সময় জুড়ে খ্রিস্টান সংস্কৃতির প্রায় সমতুল্য (পশ্চিমের বাইরে যেমন চীন, ভারত, রাশিয়া, বাইজেন্টিয়াম ও মধ্যপ্রাচ্যে খ্রিস্টানরা ছিল)।পশ্চিমা সভ্যতা আধুনিক আমেরিকা ও ওশেনিয়ার প্রভাবশালী সংস্কৃতি তৈরি করতে ছড়িয়ে পড়েছে, এবং সাম্প্রতিক শতাব্দীতে বিভিন্ন উপায়ে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে।

ইউরোপ ৫ম শতাব্দীতে রোমের পতনের পরের মধ্যযুগে প্রবেশ করেছিল, এই সময়কালে ক্যাথলিক চার্চ পশ্চিমের রোমান সাম্রাজ্যের পতনের মাধ্যমে পশ্চিমে অবশিষ্ট শক্তির শূন্যতা পূরণ করেছিল, যখন পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য (বা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য) বহু শতাব্দী ধরে পূর্বে টিকে ছিল, লাতিন পশ্চিমের সঙ্গে হেলেনিক পূর্বের বিপরীতে পরিণত হয়েছে।

ব্রিটেনে ১৮তম শতাব্দীতে শিল্প বিপ্লব শুরু হয়। জ্ঞানার্জনের প্রভাবে, পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত, গণতান্ত্রিক আধুনিক রূপে রূপান্তরের অংশ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স থেকে বিপ্লবের যুগের আবির্ভাব ঘটে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের ভূমিগুলি প্রথমে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের অংশ হয়ে ওঠে এবং তারপরে নতুন পশ্চিমা দেশগুলির আবাসস্থল হয়ে ওঠে, যখন আফ্রিকা ও এশিয়া মূলত পশ্চিমা শক্তিগুলির মধ্যে খোদাই করা হয়েছিল। পশ্চিমা গণতন্ত্রের গবেষণাগারগুলি ১৯তম শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে অস্ট্রেলিয়ায় ব্রিটেনের উপনিবেশগুলিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যখন দক্ষিণ আমেরিকা মূলত নতুন স্বৈরাচার তৈরি করেছিল। ইউরোপ থেকে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র বিংশ শতাব্দীতে অদৃশ্য হয়ে যায়, এবং ফ্যাসিবাদ ও কমিউনিজমের পর্বগুলি সত্ত্বেও, কার্যত সমগ্র ইউরোপ শতাব্দীর শেষের দিকে গণতান্ত্রিকভাবে তার নেতাদের নির্বাচন করছিল। বেশিরভাগ পশ্চিমা দেশগুলি প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং দীর্ঘস্থায়ী শীতল যুদ্ধে ব্যাপকভাবে জড়িত ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইউরোপে ফ্যাসিবাদকে পরাজিত করেছিল, এবং প্রতিদ্বন্দ্বী বৈশ্বিক শক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্থান ও একটি নতুন "পূর্ব-পশ্চিম" রাজনৈতিক বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে রাশিয়া ব্যতীত অন্যান্য ইউরোপীয় সাম্রাজ্যগুলি ভেঙে যায়, এবং নাগরিক অধিকার আন্দোলন এবং ইউরোপ, আমেরিকা ও ওশেনিয়ায় ব্যাপকভাবে বহু-জাতিগত, বহু-বিশ্বাসের অভিবাসন পশ্চিমা সংস্কৃতিতে জাতিগত ইউরোপীয়দের প্রাধান্যকে কমিয়ে দেয়। ইউরোপীয় দেশগুলো ইউরোপীয় ইউনিয়নের মাধ্যমে বৃহত্তর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতার দিকে অগ্রসর হয়। মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে ১৯৯০ সালের দিকে সোভিয়েত-আরোপিত কমিউনিজমের পতনের মাধ্যমে শীতল যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটেছিল। পশ্চিমা বিশ্ব ২১তম শতাব্দীতে উল্লেখযোগ্য বৈশ্বিক অর্থনৈতিক শক্তি ও প্রভাব ধরে রেখেছে।
Wekipedia

পাশ্চাত্য সভ্যতার বুনিয়াদ

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমি ইসলামের নৈতিক বুনিয়াদের কথা তুলে ধরার চে করেছি। ইতিমধ্যেই আমরা বুঝতে পেরেছি, ধর্মীয় অনুশাসনেরা যে পরিপূর্ণ রূপরেখা ইসলামি সভ্যতা প্রদান করেছে, ইতিহাস তা কখনোই প্রত্যক্ষ করেনি। ইসলামে অন্য সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয় আখিরাতকে। এটাকে পশ্চিমা সভ্যতার সাথে তুলনা করলে, আকাশ-পাতাল ব্যবধান দেখে চোখ কপালে উঠে যায়।

নব্য পশ্চিমাদের সকল চেষ্টা-সাধনা কেবল উপযোগবাদ এবং চলমান

(লেখক কর্তৃক সংযোজিত মূল কিতাবের ২ নং পাদটীকা) : পষ্ট করে দেওয়ার জন্যে বলছি, পশ্চিমারা সাধারণত 'ধর্মীয় অনুশাসন' শব্দটিকে যে অর্থে ব্যবহার করে, আমি এখানে সে অর্থে ব্যবহার করিনি। তাদের নিজেস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পশ্চিমারা 'ধর্মীয় অনুশাসন' বলতে চার্চের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে বুঝে। তাদের ক্ষেত্রে বিষয়টি মধ্যযুগের খ্রিস্টান চার্চ এবং তার যাজকতন্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত। অপরদিকে ইসলামে 'পুরোহিততন্ত্র' কিংবা 'যাজক' বলতে কিছুই নেই। খ্রিস্টান চার্চের মতো কোনো প্রতিষ্ঠানেরও অস্তিত্ব নেই ইসলামে। সুতরাং আমরা মুসলিমরা যখনই 'ধর্মীয় অনুশাসনের' কথা বলি, আমরা কমবেশি একটি সামাজ-রাজনৈতিক কাঠামোর কথা বলি, যেখানে সকল আইন মূলত ওহির বিধান অনুসারে প্রণয়ন করা হয়, যেমন ইসলামি শারীয়া। (বিস্তারিত: আমার লেখা The Principles of State and Government in Islam বইটির "Terminology and Historical Precedent' অধ্যায় দ্রষ্টব্য) [২০] পুঁজিবাদী সমাজে নীতিশাস্ত্রের একটি তত্ত্ব হচ্ছে উপযোগবাদ (Utilitarianism) | তত্ত্ব বলে, যে আচরণ থেকে ব্যক্তি সুখ লাভ করবে, ওটাই মহৎ কাজ। সেটা ঈশ্বরের বিধান। দ্বারা সমর্থিত না হলেও কিছু আসে যায় না। ব্যক্তির সুখ-দুঃখ লাভের পরিমাণই ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠি। যে আচরণে ব্যক্তি কষ্ট পায়, যেটা অন্যায় কাজ। আর যেটা তাকে সুখ দেয়,

সেটাই

ন্যায়। তাই প্রধান বিবেচ্য বিষয় হবে : সর্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তির সুখ। একটি জাতির সর্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তির সুখ নিশ্চিত করার জন্যে, যে-কোনো কাজই বৈধ। এমনকি সেটা ঈশ্বরের উন্নতিকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। জীবনের নৈতিক বাস্তবতাকে দূরে চেনে, শুধুমাত্র বাহ্যিক সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণা করাই ওদের মৌলিক উদ্দেশ্য। যার ফলে জীবনের প্রকৃত মর্ম ও লক্ষ্য কী, এ প্রশ্ন নিয়ে ইউরোপ-আমেরিকার লোকেরা বাস্তব জীবনে কখনো মাথা ঘামায় না। জীবন-যাপনের 'ধরন' কেমন হওয়া উচিত এবং প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে মানবজাতি কতখানি অগ্রসর হয়েছে—এ প্রশ্নগুলোই তাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শেষোক্ত প্রশ্নের ক্ষেত্রে পশ্চিমাদের উত্তর খুবই ইতিবাচক। কিন্তু মুমিনদের ক্ষেত্রে এর উত্তর কিছুটা ভিন্ন হয়ে থাকে। আদম (আলাইহিস সালাম) এবং তাঁর বংশধরদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন :

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

"আমি পৃথিবীতে একজন খলিফা (প্রতিনিধি) নিযুক্ত করতে চাই।" [সূরা বাকারাহ, ২ : 30]

এই আয়াত থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, দুনিয়াতে মানুষের আধিপত্য বিস্তার এবং অগ্রগতি অর্জন করার বিষয়টি পূর্ব থেকেই নির্ধারিত ছিল। কিন্তু মানুষের এই অগ্রগতির প্রকার' কী হবে, এই ব্যাপারে ইসলাম এবং পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি ভিন্ন। পশ্চিমারা বিশ্বাস করে, দুনিয়াবি সফলতা এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার আলোকেই সামগ্রিকভাবে মানুষের

বিধানের বাইরে গেলেও কোনো সমস্যা নেই। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক এপিকিউরাস (খ্রিস্টপূর্ব ৩৪১ অব্দ) প্রথম এই মতবাদ প্রচার করেন। কিন্তু তিনি এটা কেবল ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন, সমাজের ক্ষেত্রে নয়। আধুনিক কালে এটি সমগ্র মানব-সমাজের ওপর আরোপ করা হয়। দার্শনিক জেরিমি বেন্থাম ছিলেন এই তত্ত্বের প্রবক্তা। তার পর স্টুয়ার্ড মিল এই মতবাদের বিকাশ সাধন করেন। [Encyclopaedia Britanica, ২৭/৮২০-৮২২] এই তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই পশ্চিমা সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। সে কারণেই, তারা নিজেদের সুখের জন্যে অন্য জাতির ওপর জুলুম-নির্যাতন চালাতেও কার্পণ্য করে না। নিজেদের স্বার্থের বিরুদ্ধে গেলে, পশ্চিমারা ধ্বংসাত্মক খেলায় মেতে ওঠে। এতে যদি অন্য জাতির লাখও অ-ইউরোপীয় মানুষের জীবন যায়, তবুও তাদের মধ্যে কোনো অনুশোচনা আসে না। ভিয়েতনাম যুদ্ধ, ইরাক যুদ্ধ, আফগান যুদ্ধ যার বাস্তব উদাহরণ।- (অনুবা[২১] (লেখক কর্তৃক সংযোজিত মূল কিতাবের ৪ নং পাদটীকা) : উপরিউক্ত আয়াতটির ব্যাখ্যা জানার জন্যে দেখুন : মেসেজ অফ দ্যা কুরআন-এর পাদটিকা ২২।

কৃষ্ণ সংযোজিত মূল কিতাবের ৪ নং পাদঢাকা) : উপারভত জানার জন্যে দেখুন : মেসেজ অফ দ্যা কুরআন-এর পাদটিকা।

নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব। কিন্তু পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী অগ্রগতির ধারণা ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলাম জানিয়ে দেয়, মানুষের আত্মিক মূল্যবোধ সর্বদা অপরিবর্তনশীল। আর এটি সৃষ্টিগতভাবেই

ফিতরাতের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

-

মানুষের

মানুষের ফিতরাত যে তার ব্যক্তিগত উপলব্ধি অনুযায়ী, বাড়ন্ত গাছের মতে চলমান পরিবর্তন ও উৎকর্ষের মধ্য দিয়ে যেতে পারে পাশ্চাত্যের মে ইসলাম এটা কখনোই মেনে নেয়নি। কারণ, মানুষের আত্মা জীববিজ্ঞানে বাইরের জিনিস কি না—এই ধরনের যুক্তিতর্ক থেকে ইসলাম নিজেকে পুর সরিয়ে রাখে। পশ্চিমারা ভেবেছে, বস্তুবাদী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সুযোগ-সুবিধার মতো করে নৈতিকতার উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। আসলে জীববিদ্যার তত্ত্বর গায়েবি জিনিসের ব্যাপারে প্রয়োগ করার কারণেই এই মৌলিক গলদটি তাদের হয়েছে। মূলত এ ধারণার ওপর ভর করেই পশ্চিমারা রুহকে অস্বীকার করে। কিন্তু ইসলাম বিশ্বাস করে গায়েবের প্রতি। তাই কোনোরকম সংশয় ছাড়াই স্বীকার করে নেয় আত্মার অস্তিত্বকে।

আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত উন্নতি কখনো এক জিনিস নয়, আলাদা। কিন্তু এ দুটোর মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। কারণ এরা জীবনের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে কাজ করে থাকে। তাই আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক উন্নতি একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হওয়াটা জরুরি বিষয় নয়। হয়তো কখনো কখনো তার একই সঙ্গে বিকাশ লাভ করতে পারে।

মানবজাতির বস্তুগত উন্নতির সার্বিক সম্ভাবনা এবং এর প্রতি (মানুষের) তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে ইসলাম খুব জোর নিয়ে স্বীকার করে। কিন্তু দনিয়াবি) প্রগতির মাধ্যমেই যে রুহানি জগতের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব, এই ধারণাকে। পুরোপুরি নাকচ করে দেয়। আধ্যাত্মিক জগতে উন্নতির জন্যে যা যা দরকার, তা ব্যক্তিসত্তার মাঝেই সীমাবদ্ধ। প্রতিটি ব্যক্তির জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়কে তার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির সামগ্রিক চিত্র হিসেবে বিবেন।

করা হয়।

আমরা কখনোই দলবদ্ধ হয়ে পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হতে পারব না।

আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যে প্রত্যেককে অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে। তবে সেটা আলাদাভাবে। আর এই কাজের শুরু এবং শেষটাও হবে নিজেকে দিয়েই। অবশ্য এই ধরনের ব্যক্তিকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, আধ্যাত্মিক লক্ষ্যে পৌঁছনোকে কিছুটা কঠিন করে ফেলে। কিন্তু ইসলামের টেকসই সমাজ-কাঠামো ও সামাজিক ঐক্য—পরোক্ষভাবে এটাকে সহজ করে তোলে। সমাজের দায়িত্ব হলো মানুষের বাহ্যিক জীবনকে এমনভাবে গুছিয়ে দেওয়া, যাতে প্রতিটি ব্যক্তি তার আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে বিপত্তি ছাড়াই এগোতে পারে। যেন সে যথাযথ উৎসাহ পায়। আর এ জন্যেই ইসলামি শারীয়া মানুষের আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক জীবন নিয়ে বেশ মাথা ঘামায়। এর জন্যে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি কী হওয়া উচিত, (সেটাও গুরুত্বের সাথে দেখে)।

আমি পূর্বেই বলেছি, এই ধারণার বাস্তবায়ন স্রেফ তখনি সম্ভব—যখন রুহ বা আত্মার অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেওয়া হবে। এবং মানুষের জন্মগত অপার্থিব উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে (সমাজ-কাঠামো গড়ে উঠবে)। কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা রুহের অস্তিত্বে একপ্রকার অস্বীকার করে। তাই জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে বাস্তবে তারা কখনো মাথা ঘামায় না। আসলে গায়েবি জগৎ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা এবং এর গুরুত্বকে ওরা তুচ্ছ মনে করে।

“দুনিয়ায় জন্যে সর্বজনীন নৈতিক বিধান ঠিক করে দেওয়া আছে। সেটার আনুগত্য করা সকলের ওপর ফরজ।"—এই নীতির ওপরই 'ধর্মীয় চেতনা' প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক অঙ্গনে নব্য পশ্চিমারা কারও অনুগত্যের ধার ধারে না। ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে তারা মূলত (ক্ষমতা এবং) আরাম-আয়েশের পূজা করে। আর এটা সত্যি যে, ক্ষমতার আধিপত্য বিস্তারের বাসনার মধ্য দিয়েই মানুষের জীবন-দর্শন ফুটে ওঠে।

এইসব চিন্তাধারার সূত্রপাত মূলত প্রাচীন রোমান সভ্যতা থেকে। পশ্চিমাদের বস্তুবাদী মনোভাবের আঁতুরঘর হিসেবে রোমকে দায়ী করাটা [২২] সম্রাট অগাস্টাস কর্তৃক খ্রিস্টপূর্ব ২৭ অব্দে রোম-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশাল রোম- সাম্রাজ্য ৩৯৫ খ্রিস্টাব্দে থিওডোসিউস কর্তৃক পশ্চিম/ল্যাটিন এবং পূর্ব/গ্রিক—এই দুটি সাম্রাজ্যে বিভক্ত হয়। গ্রিক সাম্রাজ্য ১৪৫৩ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। আর ল্যাটিন সাম্রাজ্য ৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে বিলুপ্ত হওয়ার পর আবার ৮০০ সালে সম্রাট শার্লেমন কর্তৃক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই সাম্রাজ্য ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। [পরিভাষা কোষ, পৃ. ৯৬] – (অনুবাদক)

অনেকের কাছে হয়তো অদ্ভুত মনে হতে পারে। বিশেষ করে যারা

অতীতের

তাদের কাছে। এক্ষেত্রে (তাদের দিকে) প্রশ্ন ছুড়ে বলা যায় : রাজনৈতিক নীতিমালা এক হওয়া সত্ত্বেও, মধ্য পশ্চিমাদের সাথে ইসলামের

দৃষ্টিভঙ্গি এতটা ভিন্ন কেন?"

এর সহজ উত্তর হলো : উভয়ের রাজনৈতিক অভিব্যক্তি কখনোই এক চিল না। (ইসলামের সাথে রোমানদের) মিল খোঁজার ব্যাপারটি ইতিহাসের কারা অধ্যায়গুলোর একটি। ভাসা ভাসা জ্ঞানের অধিকারী কিছু পশ্চিমারা বর্তমান।

প্রজন্মকে বহুকাল ধরে এটা গেলাচ্ছে।

বিস্তৃর্ণ এলাকা ও নানান জাতি-পেশার মানুষের মাঝে বিস্তার লাভ করার দিকটি বাদ দিলে, ইসলাম এবং রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে আর কোনো মিল নেই। সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি চালিকাশক্তি এবং ভিন্ন ঐতিহাসিক লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে উভয়ের অস্তিত্ব টিকে ছিল। তা ছাড়া কাঠামোগত দিক থেকেও ইসলাম এবং রোম সাম্রাজ্যের বিস্তর ফারাক দেখা যায়। ভৌগলিক অগ্রগতি

[২৩] পশ্চিমা সভ্যতা পদে পদে রোমানদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। এই যেমন সপ্তাহের প্রতিটি দিনের কথাই ধরুন। এগুলোর সাথে রোমান পৌত্তলিকতার সম্পর্ক খুব গভীর। Saturday বা শনিবার শব্দটির উৎপত্তি Saeterndaeg থেকে। এর মানে হলো Satuern এর দিবস। Satuern কে ছিল জানেন? রোমানদের কৃষিদেবতা। আবার শুক্রবার বা Friday শব্দটি এসেছে Frigedaeg থেকে, যার মানে Frig এর জন্যে নির্ধারিত দিন। সৌন্দর্য ও ভালোবাসার দেবী ছিল ফ্রিগ। সে আবার দেবতা Woden এর স্ত্রী। এভাবে প্রতিটি দিনের নামের সাথেই জড়িয়ে আছে রোমানদের কোনো-না-কোনো দেবদেবীর নাম।

পশ্চিমা সভ্যতা ছিল ইহুদি-খ্রিস্টান জাতির সভ্যতা। কিন্তু ওরা ঈসা (আলাইহিস সালাম) বা যিশুর শিক্ষাকে বিকৃত করেছে। রোমানদের পৌত্তলিক সভ্যতার সাথে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে ফেলেছে। তৎকালীন রোমান দেবতাদের আকৃতি ছিল মানুষের মতো। স্রষ্টার এই মানবধর্মী ধারণাকে তারা যিশুর বেলাতেও প্রয়োগ করে। যিশুকে বানিয়ে ফেলে রক্তমাংশের ঈশ্বর বা মানব-দেবতা। আর সমবেত উপাসনার দিন সাবাত বা শনিবারের বদলে নির্ধারণ করা হয় রবিবারকে। কারণ, রোমানদের শীর্ষদেবতা জুপিটারের পুত্র অ্যাপোলোকে উপাসনা করা হতো এই দিনেই। অপরদিকে দলিল-প্রমাণ ছাড়াই ২৫ ডিসেম্বরকে যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন সাব্যস্ত করা হয়। এর পেছনেও রয়েছে রোমান প্রভাব। ২৫ ডিসেম্বরকে রোমানরা 'অজেয় সূর্যের জন্মদিন' (Natalis Solis Invicti) হিসেবে পালন করত। [বিলাল ফিলিপস, সভ্যতার সংকট, পৃ. ২২- [২৪] এভাবেই পশ্চিমাদের দর্শন আস্তে আস্তে পৌত্তলিক ও বস্তুবাদীতায় রূপ নেয়। এর পেছনে

ও রাজনৈতিক পরিপক্কতা অর্জন করতে রোমানরা সময় নিয়েছিল এক হাজার বছর। অথচ ইসলামি সভ্যতা পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয়েছিল মাত্র আশি বছরের ব্যবধানে। উভয়ের স্থায়িত্বকাল হিসেব করলে আরও অবাক হতে হয়। হান এবং গথা সম্প্রদায়ের অভিযান রোমানদের পতনকে এতটাই প্রভাবিত করেছিল যে, এক শতাব্দীর মধ্যেই তার অস্তিত্ব

পুরোপুরি বিলীন হয়ে যায়। তাদের সাহিত্য এবং স্থাপত্যকলা ছাড়া আর কোনো কিছুই বর্তমান থাকেনি।

(এরপর উত্থান ঘটে) বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের। এই সাম্রাজ্যকে রোমানদের একমাত্র উত্তরসূরি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ, এটি প্রাচীন রোমের অধীনে থাকা কিছু অঞ্চলের ওপর তার শাসন কায়েম করতে পেরেছিল। কিন্তু এর সামাজিক এবং রাজনৈতিক কাঠামোর সাথে রোমের শাসনব্যবস্থার মিল ছিল খুবই সামান্য। অন্যদিকে ইসলামি সাম্রাজ্য—যাকে খিলাফত হিসেবে রূপায়িত করা হয়—বিশাল সময় ধরে উত্থান-পতন এবং (ক্ষমতার) পট-পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু তার বিধি-ব্যবস্থা একই থেকেছে সব সময়। বহিরাগত আগ্রাসন, এমনকি মঙ্গোলদের আক্রমণের সময়েও খিলাফতের সমাজ-কাঠামো এবং নিরবচ্ছিন্ন রাজনৈতিক ভিত টলে যায়নি। অথচ রোমান সাম্রাজ্যের ওপর হান কিংবা গথদের চালানো ভয়াবহ হামলার চেয়েও মঙ্গোলদের আক্রমণ ছিল বেশি খতরনাক। তবে এই আক্রমণ অবশ্য অর্থনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পদস্খলনে দারুণ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু রোমানদের সাথে তুলনা করলে দেখা যায়—ওদের পতন হতে সময় লেগেছিল প্রায় একশো বছর। অপরদিকে ইসলামি খিলাফত বিলীন হয়েছিল দীর্ঘ এক হাজার বছরের ব্যবধানে। এর ইতি ঘটেছিল

[২৪] হানদের উৎপত্তি কোথায়, এ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এরা এসেছে কাজাখাস্তান থেকে। এরা ছিল পশুপালক যাযাবর জাতি। সর্দার আতিলার নেতৃত্বে হানরা ৩৭৩-৪৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, প্রায় আশি বছর ধরে রোমান সাম্রাজ্যের ওপর আক্রমণ চালায়। সশস্ত্র আক্রমণ রোমান সাম্রাজ্যকে তছনছ করে দেয়। এরা মধ্য ইউরোপে একটি বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলে। [Encyclopaedia Britannica, ১১/৯৩২] - (নিরীক্ষক) [২৫] গথ হলো জার্মান জাতির একটি গোত্র যা দুইটি শাখায় বিভক্ত—অস্ট্রগথ ও ভিজিগথস। এই গোত্রটি শত বছর ধরে রোমান সাম্রাজ্যে লুটতরাজ চালিয়ে ছিল। [Encyclopaedia Britannica, ১২/২৭৩] (নিরীক্ষক)

উসমানি খিলাফতের রাজনৈতিক পরাজয়ের মাধ্যমে। মূলত এরই সূত্র নার পরবর্তীকালে (ইসলামি সমাজব্যবস্থায় ফাটল ধরে। যার চাক্ষুষ সাক্ষি আমরা।

এসব ঘটনা আমাদেরকে এই উপসংহারে আসতে বাধ্য করে যে, মানুষের দেখা তাবৎ সমাজব্যবস্থার চেয়ে ইসলামি খিলাফতের অভ্যন্তরীণ শক্তি। এবং সামাজিক গভীরতা বেশি মজবুত। চীনা সভ্যতাও বহু শতাব্দী । দাপট দেখিয়ে বেড়িয়েছে। কিন্তু (ইসলামের) সাথে তার কোনো তুলনাই চলে না। চীন (এশিয়া) মহাদেশের এক প্রান্তে অবস্থিত। প্রায় অর্ধ শতাব্দী। আগেও—আধুনিক জাপানের উত্থানের পূর্ব পর্যন্ত—এটি ছিল বিরোধী শক্তির ধরাছোঁয়ার বাইরে। অবশ্য মঙ্গোলদের সাথে যুদ্ধ চলাকালীন, চেঙ্গিস খান • তার অনুসারীরা

চীনা সীমান্তের আশপাশ দখল করে নিয়েছিল। অন্যদিকে ইসলামি খিলাফতের বিস্তৃতি ছিল তিন মহাদেশ জুড়ে। আর এটি সব সময় তুলনামূলক শক্তিশালী ও খতরনাক শত্রু দ্বারা বেষ্টিত ছিল। প্রাচীনকাল থেকেই নিকট-প্রাচ্য ও মধ্যপ্রাচ্য ছিল বিভিন্ন জাতি এবং সাংস্কৃতিক শক্তির রণক্ষেত্র। কিন্তু বরাবরই ইসলামি সমাজব্যবস্থা ছিল সেখানকার অপরাজেয় শক্তি। যা আজও বিদ্যমান। এই বিস্ময়কর দৃশ্যপট ব্যাখ্যা করার জন্যে আমাদের দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এই অভিজাত সামাজ- কাঠামোর মজবুত ভিত্তি হচ্ছে কুরআন। আর মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহ একে দিয়েছে টেকসই বন্ধন। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্যে রোমান সাম্রাজ্যের কাছে ছিল না কোনো আধ্যাত্মিক উপাদান। যার ফলে এটা খুব দ্রুতই বিলীন হয়ে যায়।

এই প্রাচীন সাম্রাজ্য দুটোর মধ্যে আরও কিছু তফাত রয়েছে। ইসলামি [২৬] সাধারণত দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার ভূমধ্যসাগর এবং ভারতবর্ষের মধ্যবর্তী দেশসমূহকে নিকট-প্রাচ্য বা Near East বলা হয়। তবে এর অবস্থান নিয়ে Britannica, National Geographic, আমেরিকার Department of State এবং, জাতিসংঘের মধ্যে মতবিরোধ [২৭] ১৮৫০ সালের দিকে ব্রিটিশরা এই পরিভাষাটির ব্যবহার শুরু করে। ইরান, এশিয়া মাইনর, মেসোপোটেমিয়া, লেভান্ট, মিশর-এর অন্তর্ভুক্ত। প্রায় ১৮ টি আধুনিক রাষ্ট্র এই অঞ্চলে অবস্থিত। যার মধ্যে আছে মিশর, ইরাক, ইরান, সৌদি আরব, লেবানন, সিরিয়া, ফিলিস্তিন আছে।

পর, হরাক, ইরান, সৌদি আরব, লেবানন, সিরিয়া, ফিলিস্তিন

খিলাফতে কোনো গোষ্ঠীকেই বিশেষ নাগরিক সুবিধা দেওয়া হতো না। আর ইসলামের ঝাণ্ডাধারী ব্যক্তিরা ওই আদর্শকেই ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন, যেটাকে তারা মহিমান্বিত সত্য বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু রোমান সাম্রাজ্যের মূলমন্ত্র ছিল শাসনক্ষমতা এবং অন্য জাতিকে শোষণের মাধ্যমে নিজের মাতৃভূমিকে সমৃদ্ধ করা। একটি বিশেষ গোষ্ঠীর মনোরঞ্জনের জন্যে রোমানরা বর্বরতা চালাতে কোনোরূপ দ্বিধা করত না। অন্যায়কে অন্যায় মনে করত না। ইতিহাসখ্যাত 'রোমের ন্যায়বিচার' শুধু রোমানদের জন্যেই বরাদ্দ ছিল। এ থেকে পষ্ট হয়, নীরেট বস্তুবাদী চিন্তাধারার ওপর জীবন-সভ্যতা গড়ে উঠলেই কেবল এই ধরনের (বর্বর) দৃষ্টিভঙ্গি লালন করা সম্ভব। বুদ্ধিবৃত্তিক এবং শৈল্পিক মোড়কে ঢাকা এই ধরনের বস্তুবাদী আদর্শের সাথে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের কোনো সম্পর্ক থাকে না। 'ধর্ম' জিনিসটা কী, আদতে রোমানরা তা জানত না। তাদের প্রচলিত 'দেব-দেবীরা' ছিল গ্রিক পুরাণের অনুকরণ মাত্র। নিছক সামাজিক রীতিনীতির সুবিধার্থে এই নিস্তেজ প্রেতাত্মাগুলোকে তারা মেনে নিয়েছিল। বাস্তব জীবনে এসব ঈশ্বরদের কোনো

ভূমিকাই ছিল না। পরামর্শের দরকার হলে, তারা পুরোহিতদের মাধ্যমে পাওয়া দৈববাণীর সাহায্য নিত। কিন্তু মানুষদের ওপর নৈতিক বিধান আরোপ কিংবা তাদের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা এই দৈববাণীর ছিল না।

রোমানদের এসব নীতির ওপর ভর করেই আধুনিক পশ্চিমা সমাজ বিকশিত হয়েছে। ওয়ারিশ সূত্রে পাওয়া রোমের সংস্কৃতিকে তারা ছড়িয়ে দিয়েছে জীবনের পরতে পরতে। চলার পথে এটি আরও অনেকের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবুও বর্তমান জমানার পশ্চিমা রীতিনীতি এবং বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি— সরাসরি প্রাচীন রোমান সভ্যতার প্রতিচ্ছবি। রোমের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক পরিবেশ যেমন আপাদমস্তক ভোগবাদী এবং ধর্ম-বিদ্বেষী ছিল, আধুনিক পশ্চিমাদের হালচাল অনেকটাই সেরকম।

আসমানি ধর্মের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ দাঁড় করতে না পেরে, ক্ষেত্রবিশেষে প্রমাণের দিকটাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, কেবলমাত্র সামাজিক ঐক্যের জন্যে পশ্চিমা চিন্তাধারায় ধর্মকে বরদাস্ত করা হয়। কিংবা মাঝেসাঝে এর

ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাত

প্রতি গুরুত্ব দেখানো করা হয়য়। কিন্তু আসমানি নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে রাখা হ বাস্তব জীবনের বাইরে। স্রষ্টার অস্তিত্বকে পাশ্চাত্য সভ্যতা সরাসরি অস্বীকার করে না। তবে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনে শ্রষ্টার কোনো স্থান বা নেই। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক দিককে সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করার পরে, তারা নিজেরাই একটি নৈতিক মানদণ্ড বানিয়ে নিয়েছে। এ কারণেই, পশ্চিমা বিশ্ব এমন সব চিন্তা-চেতনার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়, যেখানে অভিজ্ঞতালব্ধ বিজ্ঞানের আওতায় পড়ে। অথবা মানুষের সামাজিক জীবন। বাস্তব প্রভাব ফেলতে পারে। কিন্তু এ দুটো ক্ষেত্রেই স্রষ্টার অস্তিত্বের তেমন কোনো জরুরত নেই। তাই পশ্চিমা চিন্তাধারা জীবনের বাস্তব আনিয়
স্রষ্টাকে পাশ কাটিয়ে চলাকে বেশি পছন্দ করে।

এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে : “খ্রিস্টীয় চিন্তাধারার সাথে এই ধরনের কর্মপন্থা কিভাবে সমঝোতা করতে পারে? পশ্চিমাদের রুহানি জগতের মৌলিক উৎস হিসেবে যে খ্রিস্টবাদকে দায়ী করা হয়, সেটা কি আসমানি নীতিশাস্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়?"

হ্যাঁ, অবশ্যই। কিন্তু পশ্চিমা সভ্যতাকে খ্রিস্টবাদের ফল মনে করাটা, মোটাদাগে একটা ভুল ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নব্য পশ্চিমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক স্তম্ভ আসলে প্রামিন রোমান সভ্যতা। আর ওদের কাছে জীবন মানেই ভোগ-বিলাস। অসমনি নীতিশাস্ত্রের কোনো গুরুত্ব সেখানে নেই। তাদের এই ধারণাকে এভাবে বর্ণনা করা যায়: “জীবনের উৎপত্তি এবং শরীরের মৃত্যুর পর কী ঘটবে, সে সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্য-প্রমাণের মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত করে।

কিছু বলতে পারছি না। তাই অবৈজ্ঞানিক নীতিশাস্ত্র দিয়ে জীবনকে বিষিয়ে না ভুগে, বাহ্যিক উন্নতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্ভাবনার পেছনে সর্বশক্তি নিয়োগ।
করাই শ্রেয়।”
নিঃসন্দেহে পশ্চিমা সভ্যতার এমনতরো দৃষ্টিভঙ্গি খ্রিস্টবাদ, ইসলাম এবং বিশ্বাসের পুরোপুরি বিপরীত। সুতরাং খ্রিস্টবাদের কারণে পশ্চিমারা বস্তুগত অন্যান্য সকল ধর্মের কাছে অগ্রহণযোগ্য। কেননা, এমন ধারণা ধর্মীয়
উন্নতি সাধন করেছে, এই দাবি নিতান্তই অমূলক। বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও পার্থির উৎকর্ষতায় পশ্চিমারা আজ সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। এর পেছনে
ইসলামের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো মানুষের নীতি-নৈতিকতার উন্নয়ন ঘটানো। এই নৈতিকতার গুরুত্ব উপযোগবাদের তত্ত্বকে খারিজ করে দেয়। অন্যদিকে, নব্য পশ্চিমা সভ্যতার অবস্থান ঠিক এর বিপরীত। বস্তুগত উপযোগীতা তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে ছড়ি ঘুরাচ্ছে। আর নৈতিকতাকে ছুড়ে ফেলা হচ্ছে অন্ধকার কুঠুরিতে। পাশাপাশি এর তাত্ত্বিক আলোচনাকেও নিন্দার চোখে দেখা হচ্ছে। অথচ সমাজকে প্রভাবিত করার বিন্দুমাত্র ক্ষমতাও এই (তাত্ত্বিক) নৈতিকতার নেই।
এই অবস্থায় নৈতিকতার কথা বলাটাই যেন ভণ্ডামি। আর এজন্যেই মার্জিত
থেকে জন্ম হয় ১৫ টি স্বাধীন রাষ্ট্রের। (অনুবাদক)

বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী পশ্চিমের আধুনিক চিন্তকরা, পশ্চিমা সমাজের ভবিষ্যৎ পরিণতি নিয়ে আলোচনা করার সময়, আসমানি নীতিশাস্ত্রের বিধ পুরোপুরি এড়িয়ে যান। তাদের চেয়ে যারা কম জ্ঞান রাখে, নৈতিক মূল্যবোধ জিনিসটা যারা পট করে বোঝে না, তাদের কাছে এই নীতিশাস্ত্রের ধারণ অবোধগম্য বিষয় হিসেবে টিকে আছে। এদের অবস্থা যেন ওই গণিতবিদের মতো, যাকে নির্দিষ্ট কিছু অনুপদ সংখ্যা নিয়ে কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছে। কিন্তু সেই সংখ্যাগুলো তার বোধশক্তির ঊর্ধ্বে। ফলে সমাধান করতে গিয়ে) মস্তিষ্কের গাঠনিক সীমাবদ্ধতার কারণে কল্পনাশক্তির ৫ শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে, তা (অতিক্রম করার) জন্যে দরকার একটি সেতুর। নৈতিকতা নিয়ে এমন ভেলকিবাজি, যে-কোনো ধর্মীয় মূল্যবোধের জন্যেই বেমানান। আর সে জন্যেই ইসলামের সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার নৈতিক ভিত্তির কোনো তুলনা চলে না। তার মানে এই না যে, পাশ্চাত্যের কিছু কিছু সঠিক পদক্ষেপ এবং ফলিত জ্ঞান-বিজ্ঞান দেখে মুসলিমরা উদ্ধ হবে না। কিন্তু এই উদ্দেশ্য চুকে গেলে পশ্চিমা সংস্কৃতির সাথে সব দফারফা করে ফেলতে হবে। এর চাইতে আগ বাড়িয়ে, পাশ্চাত্য সভ্যতার চিন্তা-চেতনা, জীবনবোধ এবং সমাজনীতির হুবহু অনুকরণ করতে গেলে, ইসলামি ভাবাদর্শের গায়ে মারাত্মক আঘাত আসবে।

উপসংহার:

মুসলিম বিশ্বের বৃহত্তম শূন্যতা

বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের বৃহত্তম শূন্যতা হলো, এক মহানুভব মহান নেতা ও উৎসাহী ব্যক্তির যিনি সাহস, বিশ্বাস, সততা ও নিশ্চয়তার সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্মুখীন হবেন। এই আধুনিক সভ্যতার বিভিন্ন কাঠামো, বিভিন্ন চিন্তা ও রাস্তার মধ্যে একটি নতুন সড়ক সৃষ্টি করবেন, সেই সড়ক অনুসরণ, অতিশয়োক্তি ও সীমালঙ্ঘনজনিত দোষ হতে মুক্ত হবে যিনি বাহ্যিক আকৃতি প্রিয় প্রদর্শনী ও হালকা দৃষ্টিভঙ্গি হতে ঊর্ধ্বে হবেন। সত্য, যোগ্য উপকরণ, শক্তি ও সার নিখাদ বস্তুর দিকে মনোযোগ দেবেন এবং বাহ্যিক আড়ম্বরের প্রতি আমল দেবেন না ।

মুসলিম বিশ্বের মরদে কামিল

মুসলিম বিশ্বের জন্য একজন মরদে কামিল (পূর্ণ মানব) প্রয়োজন। তিনি অতুলনীয় প্রতিভাবান (Genius) এবং দেশ ও জাতির জন্য এমন এক রাজপথ উন্মুক্ত করতে সক্ষম হবেন যে পথে একদিকে এমন ঈমান বিরাজ করবে যা কেবল পয়গম্বরী আলোকে আলোকিত এবং এমন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত থাকবে যা আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহর মাধ্যমে এই উম্মতকে দান করেছেন। অপর দিকে তার কাছে এমন জ্ঞান হবে যা কোন বিশেষ দেশ অথবা জাতি বা সময়ের সঙ্গে নির্দিষ্ট নয়। তিনি ধর্ম হতে ভাল সংকল্প ও ভাল উদ্যোগ গ্রহণ করবেন যা মানবতার খেদমত ও সভ্যতা গঠনের জন্য সর্বোচ্চ সম্পদ হবে। তিনি সঠিক ও ভাল উদ্দেশে নির্ধারণ করবেন যা কেবল আসমানী দীন ও সঠিক ধর্মীয় প্রশিক্ষণ দ্বারা অর্জিত হতে পারে। এর সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতার সৃষ্ট উপকরণ উপাদান ও যন্ত্রসমূহ সংগ্রহ করবেন যা পাশ্চাত্য দীর্ঘ কালের অধ্যয়ন, গবেষণা ও শ্রমের মাধ্যমে অর্জন করেছে। কিন্তু ঈমান ও ভাল উদ্দেশ্যের অভাবে ঐ সমস্ত বস্তু হতে সঠিক উপকার লাভ করতে পারেনি, বরং একে মানবতা হত্যা ও সভ্যতার ধ্বংস অথবা অন্য কোন হীন উদ্দেশ্যের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

এই উচ্চ মস্তিষ্কসম্পন্ন সাহসী পুরুষ, যিনি পাশ্চাত্য সভ্যতা, তার সমস্ত মতবাদ, আবিষ্কার ও শক্তি-সামর্থ্য এমনভাবে ব্যবহার করবেন যেন সেগুলো কাঁচামাল (Raw materials) ও তা দ্বারা এক নতুন শক্তিশালী সভ্যতার সৌধ গঠন করবেন, যা একদিকে ঈমান, চরিত্র, আল্লাহভীতি, দয়াপ্রচিত্ততাও ও সুবিচারের ওপর স্থাপিত হবে ।

অপরদিকে সেই সৌধে তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, আবিষ্কারের শক্তি ও চিন্তার নতুনত্ব প্রকাশ পাবে। তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতাকে এই দৃষ্টিতে দেখবেন না যে, তা পরিপূর্ণতা ও উন্নতির শেষ

মঞ্জিল অতিক্রম করেছে এবং এর ওপর শেষ সীল মোহর লেগে গেছে। ফলে তাতে আর কোন সংশোধন ও সংযোজনের স্থান নেই এবং তা যেভাবে আছে সেভাবে তার সমস্ত দোষ-ত্রুটিসহ গ্রহণ করা ছাড়া কোন উপায় নেই, বরং তিনি এর সামগ্রিক কাঠামোকে ভিন্ন ভিন্ন অংশ হিসেবে বিবেচনা করে তা হতে যে অংশ বাদ দেবার ইচ্ছা হয় বাদ দেবেন এবং যে অংশ গ্রহণ করার ইচ্ছা হয় তা গ্রহণ করবেন।

অতঃপর এ দ্বারা জীবনের এমন এক কাঠামো তৈরি করবেন যা তার উদ্দেশ্যাবলী, তার আকীদা, তার নৈতিক মৌল বিষয়ষমূহের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়। ইসলাম তাকে জীবনের যে পদ্ধতি, দুনিয়া সম্বন্ধে যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি, মানব জাতির সাথে কার্যকলাপের জন্য যে বিশেষ আদেশবাণী ও পরকালের জন্য অবিরাম চেষ্টা ও অধ্যবসা এবং জিহাদের আবেগ উদ্যম দান করেছে এর ওপর তিনি প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। ফলে তা দ্বারা ঐ জীবন প্রতিষ্ঠিত হবে যে জীবন সম্পর্কে কুরআন পাক সাক্ষ্য দিয়েছে :

. ممَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَو أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحيينه حيوة
طبية و التمرينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভাল কাজ করবে, সে পুরুষ বা মহিলা হোক এবং সে ঈমান ও রাখে, তা হলে তাকে আমি ইহকালেও তার জীবন ভালভাবে অতিবাহিত করাবো এবং তাকে পরকালেও তার উৎকৃষ্ট কর্মের প্রতিদান নিশ্চয়তা দেব।

[সুরা আন নাহল : ৯]

সে জীবন পদ্ধতি, রাসূলুল্লাহর প্রতি ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এই আকীদার ওপরও প্রতিষ্ঠিত হবে যে, তিনি মানবতার জন্য পরিপূর্ণ আদর্শ, চিরস্থায়ী পরিচালক ও নেতা এবং কেয়ামত পর্যন্ত অনুকরণীয় নমুনা এবং প্রিয় নবী কোনো মা হলেন প্রিয় নেতা। তাঁর আনীত শরীয়ত জীবনের নীতি, আইন তৈরির ভিত্তি ও একমাত্র জীবন পদ্ধতি, যা দ্বারা ইহকাল-পরকালের সফলতা অর্জন করা যায় এবং এ ছাড়া আল্লাহ তা'আলার নিকট অপর কোন জীবন পদ্ধতি গ্রহণীয় নয় ।

সেই উচ্চ মেধাসম্পন্ন সাহসী ব্যক্তি যিনি পাশ্চাত্য হতে এমন জ্ঞান অর্জন করেন যা তার জাতি ও দেশের জন্য প্রয়োজন, যে সমস্ত জ্ঞানের কার্যকর উপকারিতা রয়েছে এবং যার ওপর পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য কারও ছাপ বা সীল মোহর করা হয়নি। তাকে একমাত্র অভিজ্ঞতালব্ধ ও কার্যকর (Sciences) জ্ঞান বলা যেতে পারে। অন্ধকার যুগ ও ধর্মদ্রোহিতার আমলে (যখন ইউরোপ নিজের বুদ্ধিমত্তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল এবং ধর্মীয় সত্যাসত্য সম্পর্কে ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে চিন্তা করার উপযোগী ছিল না।) ঐ সমস্ত জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গির ওপর যে ময়লা-আবর্জনা পড়েছিল তাকে পরিষ্কার করে দেবে এবং তাকে এভাবে ঝেড়েমুছে নেবে যেমন মাটির স্তূপ হতে অথবা কাদা হতে কোন হীরক অথবা চমকপ্রদ মুক্তা লাভ করা যায় । তিনি উপকারী

জ্ঞানসমূহকে নাস্তিকতা, ধর্মদ্রোহিতা ও ঐ সমস্ত ভুল ফলাফল হতে পরিষ্কার ও মুক্ত করে অর্জন করবেন যা জোরপূর্বক ঐগুলোর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। পাশ্চাত্য হতে যে সমস্ত জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবেন তার মধ্যে ঈমানের প্রাণ সঞ্চার করবেন এবং তাকে ধর্মীয় রঙে ডুবিয়ে নিজস্ব করে নেবেন । এ দ্বারা বৃহৎ ও বিপ্লবী ফলাফল সৃষ্টি করবেন যা মানবতার জন্য অতিশয় উপকারী ও মঙ্গলজনক হবে এবং তার এ ব্যবস্থার ফলাফল তার পাশ্চাত্য শিক্ষকদের শিক্ষা হতে অধিক মূল্যবান হবে। তিনি যেখানে পৌঁছবেন সেখানে তার শিক্ষকদের চিন্তা ও খেয়াল পৌঁছেতে সক্ষম হয়নি ।

I

তিনি ঐ ব্যক্তি যিনি পাশ্চাত্যকে নিজের ইমাম, পরিচালক ও নিজকে পাশ্চাত্যের অনুসরণকারী শিষ্য ও মুখাপেক্ষী বলে মনে করেন না, বরং তিনি মনে করেন যে, তিনি পাশ্চাত্যের একজন সহগামী ভ্রমণকারী ও সমসাময়িক ব্যক্তি। অবশ্য তারা বিশেষ অবস্থার কারণে কতক জড় ও অর্থনৈতিক জ্ঞানে প্রাধান্য অর্জন করেছেন। তিনি পাশ্চাত্যের ঐ সমস্ত অভিজ্ঞতা হতে পাঠ গ্রহণ করবেন কিন্তু নুবুওয়াত (পয়গম্বরী শিক্ষা) যে আলো তাকে দান করেছে তা দ্বারা তাতে সংযোজন করবেন, বরং তিনি এ কথা মনে করবেন যে, তাকে পাশ্চাত্য হতে বহু কিছু অর্জন করার প্রয়োজন আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যেরও তার থেকে বহু কিছু অর্জন করার প্রয়োজন আছে। আর পাশ্চাত্য তার থেকে যা গ্রহণ করবে তা বহু গুণে উত্তম ও উন্নত হবে ঐ সমস্ত হতে যা পাশ্চাত্য হতে তিনি গ্রহণ করতে পারেন।
তিনি নিজ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এবং জড়বস্তু ও আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহের এক সুন্দর সমন্বয় সাধন করে এমন এক পথ, এমন এক জীবন।

পদ্ধতি সৃষ্টি করার চেষ্টা করবেন যার প্রতি সম্মান দেখানো, যার অনুকরণ করার জন্য পাশ্চাত্যও বাধ্য হবে। ফলে চিন্তাধারা ও সভ্যতার পাঠশালার মধ্যে এমন এক পাঠশালার সংযোজন হবে যা বিশ্বের বৃহত্তম চিন্তাবিদগণকে চিন্তা ও মনোযোগের দাওয়াত দেবে এবং বৃহৎ জাতিসমূহকে কর্মের আমন্ত্রণ জানাবে। তা মুসলিম বিশ্বের অথবা কোন মুসলিম দেশের এমন উচ্চ মেধাসম্পন্ন সাহসী নেতার নমুনা হবে যার এ সকল দেশে (যেখানে প্রতি প্রকারের দলপতি ও নেতা প্রচুর সংখ্যক পাওয়া যায়) এখনও অভাব রয়েছে ।
আমাদের এই সুন্দর হৃদয়গ্রাহী স্বপ্ন ও কল্পিত ব্যক্তি দেহে ও জ্ঞানে এতই শক্তিশালী হবেন যার পাশে যদি মুসলিম বিশ্বের অসহায় নকলপ্রিয় চাটুকার ও অনুগত নেতাকে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়, তবে তিনি ঐ মহৎ ব্যক্তির তুলনায় খুবই হীন বলে প্রতিপন্ন হবেন। চিন্তা, কল্পনা, সংকল্প, সাহস ও যোগ্যতায় নিম্ন মানের (PYGMIES) হবেন। প্রাচ্যের ঐ সরদার ও নেতা যারা এই অর্ধ শতাব্দিতে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন তারা কেউই নেতৃত্বের সেই উচ্চ পর্যায়ে

পৌঁছতে পারেননি এবং কেউ সেই সকল প্রয়োজন পূর্ণ করেননি যা বর্তমান যুগে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় বলে প্রতীয়মান হয়েছে। কবি ইকবালের কবিতায় এ কথারই প্রতিফলন ঘটেছে :

نہ مصطفی ، نہ رضا شاہ میں ھے اس کی نمود
کروح شرق بدن کی تلاش میں ھے ابھی -

অর্থাৎ মুস্তফা কামাল অথবা রেজা শাহ কারও মধ্যে এর প্রকাশ হয়নি। প্রাচ্যের আত্মা এখনও দেহের সন্ধানে রয়েছে।

মুসলিম দেশসমূহের কর্ম ও আধুনিক ইতিহাসের সর্ববৃহৎ কীর্তি

আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য সভ্যতা উন্নতির শেষ সীমায় পৌঁছেছে। অন্য দিকে মুসলিম দেশসমূহ নিজেদের বিশেষ অবস্থা ও ঐতিহাসিক কারণে এতে সমানভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারেনি। সম্ভবত যদি ঐরূপ করতে পারা যায় বা করা হয় তাহলে তাদের জন্য তাদের আকীদা, জীবন পদ্ধতি, উদ্দেশ্য, বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে এরূপ করা যেমন সম্ভব নয়, বৈধও নয় বা এটা তাদের জন্য ধর্মীয়

মৃত্যু

ও সামাজিক আত্মহত্যার সমতুল্য হবে। এই অবস্থায় অনুকরণ, অনুসরণ প্রত্যাখ্যানের মাঝে একটি সুরক্ষিত, উচ্চ ও সম্মানিত পথ রয়েছে । এটা কেবল এই সমস্ত দেশের পদমর্যাদার উপযোগীই নয়, বরং তা নতুন ইতিহাসের সর্ববৃহৎ বিপ্লবী পদক্ষেপ এবং সময়ের সর্ববৃহৎ গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র চাহিদাও বটে। এটা হলো আধুনিক সভ্যতার নেতৃত্ব দান,এর মধ্যে জীবনের নতুন প্রাণ ফুঁকে দেয়া, একে সৎ উদ্দেশে ও যাত্রাপথের সঠিক গন্তব্য স্থানের সন্ধান দান করা, একে নুবূওয়াতের প্রদত্ত ঈমান ও প্রেমের মত দৌলতের সাথে পরিচিত করানো এবং এর সংশোধন ও পূর্ণতা দানের ব্যাপারে এমন খেদমত করা যা কেবল মুসলিম দেশসমূহই আঞ্জাম দিতে পারে এবং এই যুগে আর কেউ এই কাজে সাহস করে অগ্রসর হচ্ছে না ।

শেষ কথা

এ কথা যতই তিক্ত ও অপ্রিয় হোক, কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এই যে, বর্তমানে মুসলিম বিশ্ব সমষ্টিগতভাবে আত্মপরিচিত ও আত্মবিশ্বাসের দৌলত হতে বঞ্চিত হয়ে গিয়েছে। এই বিস্তৃত মুসলিম বিশ্বে যে সমস্ত দেশ স্বাধীন (হয়ত ঐ দেশ শত শত বছর হতে স্বাধীন অথবা তারা নিকট-অতীতে স্বাধীনতা লাভ করেছে) তার জ্ঞানে ও মানসিকতার দিক থেকে পাশ্চাত্যের এক প্রকার দাস। যেমন একটি পশ্চাৎপদ দেশ হয়, যে দেশ দাসত্বের পরিবেশে চক্ষু খুলেছে এবং বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী হয়েছে। কোন কোন সময় এই সমস্ত দেশের নেতাগণ রাজনৈতিক ময়দানে প্রশংসনীয় কথা বলেন। যে আবার কখনো যুদ্ধ জয় ও দেশের স্বাধীনতার জন্য জনগণের জান-মাল কুরবানী নিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না।

কিন্তু চিন্তাগত, সভ্যতা ও শিক্ষার ময়দানে তাদের মাঝে এই পরিমাণ আত্মবিশ্বাস, নির্বাচনের স্বাধীনতা ও সমালোচনার যোগ্যতা প্রকাশিত হয় না যতদূর একজন জ্ঞানী পূর্ণ বয়স্ক লোক হতে আশা করা যায়। অথচ ঐতিহাসিক দর্শনের এক স্বীকৃত নীতি এই যে, চিন্তা, সভ্যতা ও শিক্ষার দাসত্ব রাজনৈতিক দাসত্ব হতে অধিক বিপজ্জনক, গভীর ও কঠোর হয় এবং এর উপস্থিতিতে একটি ওয়াকিফহাল বিজয়ী জাতির নিকট রাজনৈতিক দাসত্বের প্রয়োজনীয়তা তখন আর বাকি থাকে না। এই খ্রীস্ট্রীয় বিংশ শতাব্দির প্রথামার্ধে দুনিয়া দুই বিশ্ব মহাযুদ্ধ অতিক্রম করেছে এবং তৃতীয় বিশ্ব ধ্বংসকারী যুদ্ধের বিপজ্জনক ঘণ্টা বাজছে। এক দেশ অপর দেশকে দাস বানানো এবং কোন দেশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে গ্রাস করার বিষয়টি অবোধগম্য ও প্রায় অসম্ভব মনে করা হচ্ছে।

১. কিন্তু আফগানিস্তানের ওপর রাশিয়ার সামরিক জবরদখল এই নীতিকে আহত ও সন্দিগ্ধ করেছে ।

দুনিয়ার বড় শক্তিসমূহ বর্তমানে দিন দিন রাজনৈতিক ক্ষমতার স্থলে চিন্তাগত সভ্যতার প্রভাব ও সমমনা, সমনীতির ওপর বিশেষ জোর দিয়েছে এবং তা নিয়ে সন্তুষ্ট হচ্ছে। পাশ্চাত্যের এই চিন্তাগত নীতি ও মতবাদগত ঐক্যের প্রতি যদি দুনিয়ার কোন শক্তি চ্যালেঞ্জ করতে পারে এবং এ পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে, তবে তা কেবল মুসলিম বিশ্বের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও তার ধর্মীয় ও নৈতিক দাওয়াত ও তার জীবন দর্শনই করতে পারে। কিন্তু একদিকে এই সমস্ত ঐতিহাসিক কর্ম পদ্ধতির কারণে যা আমি সামান্য বিস্তৃতির সাথে আমার রচিত “মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কি হারলো”? গ্রন্থে বর্ণনা করেছি, মুসলিম বিশ্ব পাশ্চাত্যের উত্থিত ও প্রসারিত শক্তির মুকাবিলার যোগ্য ছিল না।

তদুপরি যে শ্রেণীর লোক এই বিপ্লবী যুগে তাদের ভাগ্যের কর্ণধার হয়েছিল তারা (আমি পূর্বের এক পরিচ্ছেদে যার বর্ণনা দিয়েছি) সকলে পাশ্চত্যের কেবল মুখাপেক্ষীই ছিল না, বরং পাশ্চাত্যের ধাত্রীয় দুগ্ধ পানকারী শিশু ছিল। যাদের (মনোভাবগত) মাংস ও রক্ত এর দুগ্ধ ও কলিজার রক্ত দ্বারা প্রস্তুত হয়েছিল। অপর দিকে ঐ সমস্ত মুসলিম দেশের জনসাধারণ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকদের মধ্যে ঈমান ও আকীদার প্রভাব, নৈতিক বন্ধন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও প্রবৃত্তির প্ররোচনার মুকাবিলা করার যৎসামান্য শক্তি অবশিষ্ট ছিল (যা তা পাশ্চাত্য বহু দিন পূর্বে বঞ্চিত হয়েছে) তাকে পাশ্চাত্য বিভিন্ন উপায়ে ধ্বংস করতে উঠে পড়ে লেগে গেছে। তাদের বিভিন্ন কর্মপন্থার মধ্যে কোনটি দেখতে নিষ্পাপ ও উদার আর কোনটি বিষাক্ত ও দূষিত।

শিক্ষা ক্ষেত্রে ইউনেসকো (UNESCO)-র সাহায্যে, পৃষ্ঠপোষকতায় ও বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞদের পরিকল্পনার মাধ্যমে, কখনও পাশ্চাত্য শিক্ষক ও অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদদের দ্বারা অনেক সময় সন্দেহ সৃষ্টিকারী এবং উত্তেজনা বৃদ্ধিকারী এমন অসংযত সাহিত্য দ্বারা (যা স্রোতের ন্যায়

মুসলিম বিশ্বে বিস্তৃতি লাভ করেছে) আবার কোন সময় জীবনের মানকে উন্নত ও জীবনকে আনন্দময় করার প্রলোভন দেখিয়ে ঘরে ঘরে টেলিভিশনের ব্যবস্থা করা দ্বারা সে শক্তিকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করা হচ্ছে। অপর কোন সময় এ সমস্ত পশ্চাৎপদ দেশকে উদারতার সাথে সাহায্য করা হয়, কিন্তু ঐ সমস্ত সাহায্যের শর্তাবলীর মধ্যে থাকে কিছু পরিবর্তন ও সংশোধনের বিষয়। ঐ সমস্ত দেশের সরকার সেগুলো পূরণ করতে বাধ্য হয় ।

পরিণামে ঐ সমস্ত দেশের মুসলিম জনসাধারণের স্বভাব ও সামাজিক রীতিনীতিতে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায়, পাশ্চাত্য দূরে

অবস্থান করেও এই সমস্ত দেশের পরিবেশ ও সমাজ ব্যবস্থাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। ফলে এই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে যে, দাসত্বের পুরাতন ঘর্ষিত রীতি হতে এই দেশগুলো মুক্তি পেয়েছে সত্য, অন্যান্য আরও জরুরী বিষয়ে তারা আরো অধিক পরিমাণে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের ক্ষমতার কবলে গ্রেপ্তার রয়েছে। কবি আকবর মরহুমের সেই পুরাতন শ্লোকটির সুন্দর এক বাস্তব প্রতিচ্ছবি এই মুসলিম দেশসমূহে যত্রতত্র দৃষ্ট হয় এবং তা এত দূর অগসর হবে, তা সম্ভবত কবির ধারণা ও কল্পনায়ও ছিল না ।

کس رہے ہیں اپنے منقاروں سے حلقہ جال کا
طائروں پر سحر ہے ، صیاد کے اقبال کا

অর্থাৎ (পাখি) নিজ ঠোঁট দ্বারা জালের পরিধিকে কষে বাঁধছে, নিশ্চয় পাখিসমূহের ওপর শিকারীর কৃতকার্যতার যাদু বা মন্ত্র রয়েছে।

,

এই সমগ্র পরিবর্তন বা সংস্কারকর্ম প্রয়োগের ক্ষেত্রে এ সমস্ত দেশের নেতাগণ বড়ই উদ্যোগী ও কর্মতৎপর। পাশ্চাত্যের আধুনিক মানুষগুলো এর চেয়ে অধিক কিছু করতে পারত না, অথচ এই নেতাদের কেউ কেউ ইসলামের দাবিদার ও কেউ কেউ ইসলামী শক্তি ও ইসলামী ব্লকের কথাও আওড়ায়। তারা যেভাবে অনায়াসে

আমেরিকা ও রাশিয়ার সংস্কার ও শিক্ষার পরিকল্পনাসমূহ গ্রহণ করা হচ্ছে, যেভাবে তাদের বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞদেরকে এ সমস্ত দেশের মনোভাব ও স্বভাব পরিবর্তন করার নকশা বানাবার অনুমতি দেয়া হচ্ছে, যেভাবে আবেগ, উদ্যম, ইচ্ছা ও দৃঢ়তা সহকারে টেলিভিশনকে (কোন মৌলিক পরিবর্তন ও সংশোধন ছাড়া) ঘরে ঘরে পৌঁছাবার চেষ্টা চলছে এবং বিভিন্ন উপায়ে একে অধিক পরিমাণে সহজলভ্য করা হচ্ছে, যেভাবে প্রাচ্যবিদদের কোন কোন সৌভাগ্যবান শিষ্যদেরকে ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে সন্দেহ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার উপায় ও সুযোগ যোগাড় করে দেয়া হচ্ছে এবং যেভাবে মহিলাদের সীমাহীন স্বাধীনতা, পর্দাহীনতা, সহশিক্ষা ব্যবস্থা করা হচ্ছে যেভাবে চলচ্চিত্র শিল্পের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা করা হচ্ছে, তদ্দারা সন্দেহ হয় যে, এ সমস্ত নেতা ঐ সমস্ত পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের জ্ঞাত বা

অজ্ঞাতভাবে কার্যক্রমের যন্ত্রে পরিণত হয়েছে, বরং পাশ্চাত্যের হীন ও ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের সাথে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে শরীক আছেন। আর হয়ত তারা দেশের জনগণকে ধর্মীয় মর্যাদাবোধ, চারিত্রিক অনুভূতি, ভাল মন্দের প্রভেদ এবং লজ্জা ও নির্লজ্জতার পার্থক্য হতে অপরিচিত করতে চাচ্ছেন।

অবস্থান করেও এই সমস্ত দেশের পরিবেশ ও সমাজ ব্যবস্থাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। ফলে এই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে যে, দাসত্বের পুরাতন ঘর্ষিত রীতি হতে এই দেশগুলো মুক্তি পেয়েছে সত্য, অন্যান্য আরও জরুরী বিষয়ে তারা আরো অধিক পরিমাণে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের ক্ষমতার কবলে গ্রেপ্তার রয়েছে। কবি আকবর মরহুমের সেই পুরাতন শ্লোকটির সুন্দর এক বাস্তব প্রতিচ্ছবি এই মুসলিম দেশসমূহে যত্রতত্র দৃষ্ট হয় এবং তা এত দূর অগসর হবে, তা সম্ভবত কবির ধারণা ও কল্পনায়ও ছিল না ।

کس رہے ہیں اپنے منقاروں سے حلقہ جال کا
طائروں پر سحر ہے ، صیاد کے اقبال کا

অর্থাৎ (পাখি) নিজ ঠোঁট দ্বারা জালের পরিধিকে কষে বাঁধছে, নিশ্চয় পাখিসমূহের ওপর শিকারীর কৃতকার্যতার যাদু বা মন্ত্র রয়েছে।

,

এই সমগ্র পরিবর্তন বা সংস্কারকর্ম প্রয়োগের ক্ষেত্রে এ সমস্ত দেশের নেতাগণ বড়ই উদ্যোগী ও কর্মতৎপর। পাশ্চাত্যের আধুনিক মানুষগুলো এর চেয়ে অধিক কিছু করতে পারত না, অথচ এই নেতাদের কেউ কেউ ইসলামের দাবিদার ও কেউ কেউ ইসলামী শক্তি ও ইসলামী ব্লকের কথাও আওড়ায়। তারা যেভাবে অনায়াসে আমেরিকা ও রাশিয়ার সংস্কার ও শিক্ষার পরিকল্পনাসমূহ গ্রহণ করা হচ্ছে, যেভাবে তাদের বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞদেরকে এ সমস্ত দেশের মনোভাব ও স্বভাব পরিবর্তন করার নকশা বানাবার অনুমতি দেয়া হচ্ছে, যেভাবে আবেগ, উদ্যম, ইচ্ছা ও দৃঢ়তা সহকারে টেলিভিশনকে (কোন মৌলিক পরিবর্তন ও সংশোধন ছাড়া) ঘরে ঘরে পৌঁছাবার চেষ্টা চলছে এবং বিভিন্ন উপায়ে একে অধিক পরিমাণে সহজলভ্য করা হচ্ছে, যেভাবে প্রাচ্যবিদদের কোন কোন সৌভাগ্যবান শিষ্যদেরকে ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে সন্দেহ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার উপায় ও সুযোগ যোগাড় করে দেয়া হচ্ছে এবং যেভাবে মহিলাদের সীমাহীন স্বাধীনতা, পর্দাহীনতা, সহশিক্ষা ব্যবস্থা করা হচ্ছে যেভাবে চলচ্চিত্র শিল্পের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা করা হচ্ছে, তদ্বারা সন্দেহ হয় যে, এ সমস্ত নেতা ঐ সমস্ত পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাবে কার্যক্রমের যন্ত্রে পরিণত হয়েছে, বরং পাশ্চাত্যের হীন ও ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের সাথে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে শরীক আছেন। আর হয়ত তারা দেশের জনগণকে ধর্মীয় মর্যাদাবোধ, চারিত্রিক অনুভূতি, ভাল মন্দের প্রভেদ এবং লজ্জা ও নির্লজ্জতার পার্থক্য হতে অপরিচিত করতে চাচ্ছেন।

মানব প্রকৃতির এই দুর্বলতা হতে ঐ সমস্ত লোক রক্ষা পায় অথবা তার ওপর জয়ী হয় যাদের মধ্যে পয়গম্বরদের (আলাইহি মুসাল্লাম) শিক্ষার প্রভাব, ঘাঁটি আল্লাহভীতি ও সত্য মানবপ্রেম সৃষ্টি হয়ে যায়। দুর্ভাগ্যবশত পাশ্চাত্য শত শত বছর এই সম্পদ হতে বঞ্চিত হয়ে রয়েছে। পাশ্চাত্যের ক্ষমতা ও কৃতকার্যতার ইতিহাস পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, যে সমস্ত দেশ তাদের অধীনস্থ হয়েছে তাদের মধ্যে এই নৈতিক অপবিত্রতা ও অবক্ষয় নিশ্চয়ই অনুপ্রবেশ করছে। এই নৈতিক অবক্ষয় তাদের প্রধান ও নিত্য সহচর। যেমন কোন সাহসী ও ন্যায়পরায়ণ গ্রন্থকার ও সমালোচকের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ প্রাচ্যের দেশসমূহে নৈতিক বিশৃঙ্খলা বিস্তার ও সন্দেহ সৃষ্টি করার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে চেষ্টা করেছে। খৃস্ট ধর্মের অনুসরণকারী পাশ্চাত্য তাদের ধর্ম বিশ্বাসে যদি সন্দিগ্ধ ও সংশয়ী (Agnostic) হয় এবং যদি তাদের আধুনিকতা ও প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গি তাদেরকে নাস্তিকতা ও অবিশ্বাসের সীমা পর্যন্তও পৌঁছে দেয়, তবুও মুসলিম জাতি ও মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কে তারা গোঁড়া খৃষ্টান। এ ক্ষেত্রে তারা তাদের জন্মশত্রু ও রক্তপিপাসু ইহুদীদের সাথেও আপস করে ও করতে পারে এবং তাদেরকে মুসলমানদের ওপর প্রকাশ্যে প্রাধান্যও দিতে পারে ও দিচ্ছে। মুসলিমদের ব্যাপারে এই গোঁড়ামি তাদের অভ্যাস ও স্বভাব হয়ে গিয়েছে। 'অবস্থা যা-ই হোক, তাদের সুযোগ-সুবিধা তাদের নিকট প্রতিটি জিনিস হতে প্রিয় ও আদরণীয় । এ কথা বার বার পরীক্ষা করা হয়েছে যে, যদি কোন ইসলামী শক্তির সাথে কোন অনৈসলামী শক্তির সংঘর্ষ হয়, তা হলে তারা সর্বদা অনৈসলামী শক্তির পক্ষে খোলাখুলিভাবে থাকে অথবা পর্দার আড়ালে থেকে অনৈসলামী শক্তির সাহায্য করে। ১৯৬৭ সালের জুন মাসে আরব ইহুদীর সংঘর্য দিবালোকের মত এ কথা প্রমাণিত করে দিয়েছে যে, মুসলমানদের কোন সম্প্রদায় অথবা দল কোন পাশ্চাত্য অথবা প্রাচ্য ব্লক হতে কোন আন্তরিকতাপূর্ণ সাহায্য ও বন্ধুত্বের আশা করতে পারে না। মুসলমানদেরকে প্রতিটি পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্তের সময় আল্লাহর ওপর, নিজ বাহুবল ও নিজ উপায়-উপকরণের ওপর ভরসা করা উচিত।

মুসলিম দেশসমূহের নেতৃবৃন্দ ও পরিচালকদের বোঝা উচিত যে, লক্ষ্যবিহীন আধুনিকতা, পশ্চিমা সভ্যতা, এর সন্দেহ ও বিশৃঙ্খলা দ্বারা যদিও সাময়িকভাবে তাদের ও তাদের স্থলবর্তী লোকদের লাভ হচ্ছে কিন্তু সমষ্টিগতভাবে জাতির যেরূপ ক্ষতি হয়েছে এবং যেরূপে এর মূলে কুঠারাঘাত করা হয়েছে, শত শত বছরের চেষ্টায়ও এর ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব হবে না। এ সমস্ত মুসলিম জাতির মধ্যে বহু মুসলিম বিশ্ব দুর্বলতা ও জটিলতা থাকা সত্ত্বেও শক্তিশালী ঈমানী আবেগ, আল্লাহ তা'আলার নামে প্রাণ দেয়ার জযবা, আনুগত্য, বাধ্যতার স্বভাব, অকপটতা ও ভালবাসার উদ্যম যথেষ্ট পাওয়া যায়। চারিত্রিক এই সকল বৈশিষ্ট্য হতে দুনিয়ার অধিকাংশ বস্তুবাদী জাতি বঞ্চিত হয়ে গিয়েছে। সমস্ত মুসলিম দেশের জনসাধারণ দুঃখজনক অজ্ঞতা ও পশ্চাৎপদতা সত্ত্বেও এমন উত্তম কাঁচামাল বা উপকরণ যা দ্বারা শ্রেষ্ঠ মানব তৈরি

করা যেতে পারে। তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি হলো তাদের ঈমান ও অকপটতা এবং তাদের সরলতা ও আবেগপ্রবণ উদ্দীপনা।

এ শক্তি বার বার আশ্চর্যজনক কীর্তি সম্পাদন করেছে এবং কোন কোন সময় অসম্ভবকেও সম্ভব করেছে এবং যখন কোন সময় এই সমস্ত দেশের ওপর জটিল বিপদসংকুল সময় এসে পড়ে তখন মুসলিম জনসাধারণের এই ঈমানী আবেগ ও অকপটতা ও সরলতা কাজে আসে। নিখুঁত সত্যপ্রিয়তা ও বাস্তবাদিতার জন্য এই শক্তির কদর করা উচিত এবং এদের এই শক্তিকে দেশের হেফাজত, মজবুতির জন্য ও বিশ্বে কোন বড় ভূমিকা আদায় করার জন্য বৃহত্তম নির্ভরশীল সম্পদ মনে করা উচিৎ। কিন্তু এই আধুনিকতা ও পাশ্চাত্যের প্রভাবে ঐ সমস্ত জনগণের শক্তিতে ঘুণ লেগে যাচ্ছে এবং তাতে এক নৈতিক ক্যান্সার সৃষ্টি হচ্ছে যার চিকিৎসা অসাধ্য।

শিক্ষা ও শিল্পে পাশ্চাত্যের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ও অগ্রগতি অনস্বীকার্য। তাদের এই ফলতার প্রতি চক্ষু বন্ধ করে রাখা বুদ্ধিমানের কথাও নয় এবং ধর্মের শিক্ষাও নয়, কার্যত এট সম্ভবও নয়। মুসলিম বিশ্বের সম্মুখে কেবল দু'টি পথ উন্মুক্ত, প্রথমত তাদের বিস্ময়কর উন্নতি দ্বারা জাদুগ্রস্ত হয়ে তাদের পূর্ণ জীবন দর্শন, বিশ্ব জগত সম্পর্কে ধারণা, অদৃশ্য জগতের জ্ঞান ও আকীদা, তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, তাদের নৈতিক মূল্যবোধ ও তাদের জীবন পদ্ধতি তথা সব কিছু গ্রহণ করা এবং নিজেদের অস্তিত্ব তাদের ছাঁচে সম্পূর্ণভাবে ঢালাই করার চেষ্টা করা। এটা করতে হলে নিজেদের মূল প্রকৃতির প্রতি পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করতে হবে যা নির্লজ্জ ধর্ম ত্যাগ ও আত্মিক আত্মহত্যার সমতুল্য এবং ঐ মানবগোষ্ঠির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা করা যার শেষ ভরসা হল সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ ও তাঁর উম্মত।

এই উম্মত লক্ষ্যহারা হলে, অপ্রয়োজনীয় পরিশ্রম ও লাভবিহীন শ্রমে আত্মনিয়োগ করলে দীর্ঘ ও জটিল মনোযুদ্ধ, আত্মিক অশান্তি, মানসিক শক্তি অপচয় ও সময়ের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই হবে না। এটা একটি সুনির্মিত, মজবুত অট্টালিকাকে বিধ্বস্ত করা, যার ধ্বংসাবশেষের ওপর অপর একটি সৌধ নির্মাণের কাঁচামাল ও উপকরণ আর নেই, এর যোগ্য স্থপতিও নেই, জলবায়ু ও পরিবেশের সঙ্গে এর সামঞ্জস্যও নেই, অতীতের সাথে কোন সম্পর্কও নেই। মুসলিম বিশ্বের যে যে অঞ্চলে ও যে সমস্ত দেশে এই চেষ্টা চলছিল তা কোথাও কৃতকার্য হতে পারেনি। যখনই এই অকৃত্রিম ও অস্বাভাবিক ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয় এবং জনসাধারণের প্রিয় ও কাজকর্ম প্রকাশ করার সুযোগ আসে তখনই তারা যত শীঘ্র সম্ভব এই ঝুলকে নামিয়ে দূরে নিক্ষেপ করে। কারণ সেগুলো তাদের শরীরের গঠন, আত্মার প্রকৃতি ও সৃষ্ট স্বভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল নয়। বর্তমানে তুরস্কে দেখা যাচ্ছে ও মিসরেও, সিরিয়ায়ও অতি শীঘ্র এটাই দেখা যাবে।

দ্বিতীয় পথ হল এই যে, পাশ্চাত্য হতে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং শিল্প কারিগরি ও প্রযুক্তিবিদ্যা ও গবেষণালব্ধ আবিষ্কারসমূহ যেগুলোর সম্পর্ক অভিজ্ঞতা, বাস্তবতা ও মানব পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের সাথে রয়েছে সেগুলোকে প্রশস্ত মনে গ্রহণ করা এবং তা দ্বারা উপকৃত হওয়া। অতঃপর সেগুলোকে ঐ আল্লাহপ্রদত্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ও ইজতিহাদের (ইসলামী জ্ঞানের সুপণ্ডিতদের অনুসন্ধানী তৎপরতা) সাহায্যে ঐ সমস্ত উচ্চ উদ্দেশ্যের অধীন ও খাদিম বানিয়ে দেয়া, যা শেষ নবী ও শেষ কিতাব (কুরআন) তাদেরকে দান করেছে এবং যার কারণে তারা শ্রেষ্ঠ উম্মত ও শেষ উম্মতের উপাধি পেয়েছে। উপায় ও উদ্দেশ্যাবলীর এটা এক অতি সুন্দর মিলন, যা থেকে বর্তমানে পাশ্চাত্য বহির্ভূত ও প্রাচ্য বঞ্চিত। পাশ্চাত্য কেবল শক্তিশালী উপায়-উকরণসমূহের পুঁজিতে পুঁজিবান বটে, তবে ভাল উদ্দেশ্যাবলী হতে শূন্যহস্ত। প্রাচ্য (ইসলামী) ভাল উদ্দেশ্যাবলীর একমাত্র ধারক-বাহক নিঃসন্দেহে কিন্তু প্রভাবশালী উপাদানসমূহ হতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ।

পাশ্চাত্য সব কিছুই করতে পারে কিন্তু করে না। আরো ভাল কথায় বলা যায় তারা করতে জানে না। ইসলামী প্রাচ্য সব কিছুই করতে চায় কিন্তু কিছুই করতে পারে না। এই সুস্থ-সুষ্ঠু উপাদানের সমন্বয়ে ও সংমিশ্রণে জগতের ভাগ্য পরিবর্তন করে দেয়া যেতে পারে এবং তাদেরকে আত্মহত্যা ও আত্মদহনের পথ হতে সরিয়ে ইহকাল ও পরকালের চিরস্থায়ী সৌভাগ্যের পথে পৌঁছে দেয়া- এটা এমন এক কীর্তি হবে যা ইতিহাসের প্রবাদ ও জগতের ভাগ্য পরিবর্তন করে ছাড়বে। এই কার্য এই উম্মতই সমাপ্ত করতে পারবে। কারণ তারা শেষ নবী এর স্থলবর্তী এবং তাঁর শিক্ষার বাহক ও রক্ষক। এ কারণে মুসলিম বিশ্বের একটিই ঘোষণা, পাহাড়, পর্বত, মরুভূমি, সমুদ্র ও মহাশূন্যে গর্জিত হবে

عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلوةَ وَأتُو الزَّكوة وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ ، هُو

مؤلكُمْ ج فَنِعْمَ المَوْلى وَنِعْمَ النَّصِير .

অর্থাৎ এবং (আল্লাহ্র) রাস্তায় জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা কর্তব্য। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন এবং দীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি। এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দীন। তিনিই পূর্বে (প্রথম কিতাবসমূহে) তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম এবং এই কিতাব ও (এ নামই রাখা হয়েছে যাতে জিহাদ কর) যাতে রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয় এবং তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষী হও। সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে (দীনকে) মজবুতির সাথে অবলম্বন কর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। কত উত্তম অভিভাবক ও কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি!

রেফারেন্স

১) ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব - সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (রাহি.)

২) অবাধ্যতার ইতিহাস - ডা.শামসুল আরেফীন শক্তি

৩) সভ্যতার সংকট - ড. আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপস

৪) সভ্যতার এপিট ওপিট - মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ খান

৫) প্রাচ্যবিদদের ইসলামচর্চার নেপথ্যে- ড. মুসতফা আস-সিবাঈ

৬) ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাত - মুহাম্মদ আসাদ, অনূদিত- জাকারিয়া মাসুদ

৭) মুসলিমদের পরাজিত মানসিকতা - ড. আব্দুল্লাহ আল খাতির

৮) হিউম্যান বিয়িং - ইফতেখার সিফাত